নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা

ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৺মাতৃদেবী আমোদিনী দেবীর পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশে—

ভূমিকা

পতন অভ্যুদয়ের দুর্গম বন্ধুর পথ ধরে ইতিহাসের রথ চলে, কত দিনের কত ঘটনা, কত লোকশ্রুতির নির্যাসটুকু ছেঁকে নিয়ে ঐতিহাসিক ইতিহাস তৈরী করেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসেও এমনি নানা উপাদান ও নানা ঘটনার সমাবেশ বিদ্যমান। সকল উপাদানের সঙ্গে আমরা এখনও সম্যক পরিচিত নই। ভাগলপুর, জালিয়ানওয়ালাবাগ, চৌরিচৌরা, সবরমতীর পদসঞ্চার, জালালাবাদ, বিয়াল্লিশের বিষাণ এবং আজাদ হিন্দের অগ্নিমন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রামের ইতিকথা আমাদের মনে আছে। এমনি অনেক সংগ্রামের একটি স্মরণীয় সংগ্রাম 'নৌ-বিদ্রোহের' কাহিনী আমাদের অনেকের কাছে বেশ কিছুটা অপরিচিত। যখন আরব সাগরের কূলে এই সংগ্রাম ঘটেছিল, তার অনেক দিন পরে সামান্য কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত শেখ শাহাদাত আলির 'নৌ-বিদ্রোহ' গ্রন্থটি আমাদের কাছে এসেছিল। এতদিন পরে আবার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্যের এই গ্রন্থটি পেয়ে, আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের একটি অমূল্য উপাদান বোধে আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এই বিদ্রোহের একজন সংগ্রামী নাবিক। নৌ-বিদ্রোহের প্রস্তুতি থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ এই গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থটি শুধুমাত্র একটি বিষয়ের আনুপূর্বিক বিবরণ নয়, এটিকে একটি স্মরণীয় দলিল বলেও অভিহিত করতে পারি। এর মধ্যে এমন কিছু বিষয়ের রূঢ় সত্যের প্রকাশ আছে যাতে বিস্মিত ও হতবাক্ হতে হয়। দেশের জন্যই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। কোন কিছুর কামনা তাঁর ছিল না। তাই তিনি নিজেকে পুড়িয়েছেন এই আগুনে। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাঁর মনের আশা পূর্ণ হয়েছে। বেঁচে আছেন কোনমতে। বাঁচার মত বেঁচে থাকা নয়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকা। তাতে কোন ক্ষোভ নেই তাঁর। তবু তো দেশ স্বাধীন হয়েছে—এই আনন্দে তাঁর মুখ একটি সুন্দর বিনয়-নম্র হাসিতে সর্বদাই উদ্ভাসিত। শুনেছি তিনি সরকার থেকে কিছু সাহায্য পান। সেইটুকু সম্বল করে সংসার চালিয়ে তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতাকে উত্তর-পুরুষদের কাছে তুলে ধরলেন আগামী দিনের বৃহত্তর কর্ম-যজ্ঞের প্রেরণা স্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে নিবেদন জানাই এইরূপ আরো অসংখ্য স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে, যে তাঁরা যদি এইভাবে তাঁদের নিজ নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতা-লব্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে সরকারী কেন্দ্রীয় ইতিহাস সংস্থায় পাঠিয়ে দেন বা প্রকাশ করেন, তাহলে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক অলিখিত অধ্যায়ের প্রকাশ ঘটবে এবং দেশবাসী সাগ্রহে সে-সব বিবরণ সকৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করে নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ করবে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য তরুণ বয়সে যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ-প্রান্তে এসে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তাঁর সেই ব্রতকথা লিখলেন, এজন্য সকৃতজ্ঞ অন্তরে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে এবং এই সার্থক গ্রন্থের প্রকাশক 'রবীন্দ্র লাইব্রেরী'কে সাধুবাদ জানাই।

রূপ-নারায়ণ
৯এ, নর্দার্ণ এভিন্যু
কলিকাতা-৩৭

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

মুখবন্ধ

রয়েল ইণ্ডিয়ান্ নেভীর বিদ্রোহের প্রাসঙ্গিক প্রামাণ্য নথিপত্র উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে, ১৯৪৪ সালের সামগ্রিক ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ উদ্ধার করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, দুঃসাধ্যও বটে। কেন না, ব্রিটিশ ভারতের উপর থেকে তাদের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব-মুহূর্তে ভারতের বুকে তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার ও অমানবিক কার্যকলাপের লিখিত অলিখিত নথিপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ যা-কিছু থাকা সম্ভব ছিল,—তা সবই ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। নতুবা এতদিনেও এই বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি কেন? তাই, দীর্ঘদিন অতীত হলেও বিদ্রোহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ থাকায় সাধারণ কর্মী হিসাবে এবং দেশমাতৃকার একজন দীনতম সেবকের কর্তব্য মনে রেখে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজে হাত লাগাবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই গ্রন্থখানি তারই একটি নিদর্শন। জানি না দেশের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট এটি কতখানি সুখপাঠ্য ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। তবে আশার আলো দেখতে পেয়েছি ইংরাজী এপ্রিল মাসের "আনন্দবাজার : বার্ষিক সংখ্যা : ১৩৭৯"তে আমার এই গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হতে দেখে।

এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে যিনি আমাকে সর্বপ্রথম উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং এই গ্রন্থের সম্পাদনা করে ও ভূমিকা লিখে আমার উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তোলেন, তিনি হলেন আমার পরম পূজ্যপাদ ডক্টর শ্রীযুত পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়। এঁর পরেই যাঁর নাম আমার নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনি হলেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সিতাংশুকুমার দাশগুপ্ত, আই. এ. এস্. মহাশয়, (ভূতপূর্ব ডেপুটি ফিন্যান্স সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমানে তিনি মণিপুর রাজ্যের পে-কমিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন।) তিনি আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, অমূল্য উপদেশ, সরকারী সাহায্য, এমন কি নিজের শারিরীক কষ্ট স্বীকার করেও সময়মতো সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি এতখানি এগিয়ে না এলে এই গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হতো কিনা

সন্দেহ। তারপর কৃতজ্ঞতা জানাই ঐতিহ্যপূর্ণ ও বহুল-প্রচারিত দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা" কর্তৃপক্ষকে এবং বিশেষ করে এই পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুত রমাপদ চৌধুরী মহাশয়কে। তাঁরা তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সত্যিই আমার অন্তরে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

আর যাঁদের কথা আমার স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য, তাঁরা হলেন খ্যাতনামা প্রকাশক 'রবীন্দ্র লাইব্রেরী' এবং 'অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কসে'র শ্রীসত্যসাধন রায়। এঁরা সকলে সহৃদয় মনোভাব নিয়ে আমার রচনাকে প্রকাশ করে আমাকে ধন্য করলেন।

যাঁদের অমূল্য উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভে আমি ধন্য হয়েছি তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির দ্রুত প্রকাশের ব্যস্ততায় অনিচ্ছাকৃত কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণ ভিন্ন তা সংশোধন সম্ভব নয়। পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা-সুন্দর চোখে তা দেখবেন আশা নিয়ে আমার 'মুখবন্ধে'র বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

২২, রাজা মণীন্দ্র রোড,
শহীদ কলোনী,
কলিকাতা-৩৭।

শ্রীফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

॥ গ্রন্থারম্ভ ॥

"...মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণসঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহ।"

১৫ই আগস্ট, তা আবার স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসবের বছর। চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বইছে। দিকে দিকে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে দেশপ্রেমিক শহীদদের নাম নিয়ে। আমিও যে আনন্দ পাচ্ছি না তা নয়। তবে এই প্রৌঢ় বয়সে যৌবনের ভাবাবেগের অবকাশ নেই। আছে নিষ্ঠুর বাস্তব অনুভূতি, আছে প্রকৃত সত্যকে জানবার আকাঙ্ক্ষা। তাই ১৫ই আগস্ট আমার পেছনে ফেলে-আসা সত্য ঘটনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি ফেলতে চাইছে। অতীত কথা না বললেও সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে সে আমার পথ-প্রদর্শক। তাকে ভালোও লাগে তাই। এই আনন্দের দিনে তার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। তাকে যেন আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। দেখা যাক আমার অতীত কী সাক্ষ্য বহন করে!

ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘকালের ইংরাজশাসন, ভারত ইতিহাসের এক গ্লানিময় অধ্যায়। এক সর্বগ্রাসী আতঙ্ক বীভৎস বিভীষিকার বাঁধনে জন-জীবনকে অক্টোপাশের মতো আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। দু'শো বছরের বিদেশী শাসনের নির্মম নির্যাতনের যে বিরাট শোষণের জগদ্দল পাথর ভারতবর্ষের বুকের ওপর চাপানো হয়েছিল, তা থেকে মুক্তির জন্যে স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের বিক্ষুব্ধ মনে একজাতীয়তাবোধের সঙ্কল্প দানা বাঁধছিল। জীবনের প্রতিটি পর্বে শাসনের নামে যে শোষণ ও দমননীতির চাবুক মারা হচ্ছিল তাতে

জর্জরিত হয়ে দেশপ্রেমিক, স্বাধীন-চেতা মানুষের অন্তর বিস্ফোরণের এক তীব্র জ্বালায় ছটফট করে মরছিল। আত্মসম্মান, অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধহীন রুগ্ন সমাজের স্বাভাবিক দান তো দুর্বল পঙ্গু এক অচল সমাজব্যবস্থা—যা সমগ্র জাতিকে ক্ষয়রোগের মতো তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু কোন জাগ্রত তরুণ-প্রাণ জাতির এই অসহায় মুমূর্ষু অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দিতে পারে না। তাই তারা জাতির লাঞ্ছনাবোধে অভিশপ্ত জীবনের দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণায় এক নূতন জীবনের স্বপ্ন দেখলো,—যে জীবনে ভীরুতার গ্লানি নেই, পরাধীনতার অভিশাপ নেই,—আছে শুধু মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীন, একান্ত নিজস্ব জীবনে এক অনাবিল অফুরন্ত মুক্তির আশ্বাস। তাই সেদিন যুব-সমাজ আত্মত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের বজ্রদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জন্মভূমিকে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য মৃত্যুপণ সঙ্কল্পে ব্রতী হয়েছিল। রক্তের লেখায় যে অমরত্বের ইতিহাস বীর বিপ্লবী সেনানীরা রচনা করে গেছেন, তা শুধু বিপ্লবের ইতিহাসই নয়—ভাবীকালের যুবশক্তির উদ্দীপ্ত চেতনা, প্রেরণা ও স্বাধীনতাকামীর জীবন-বেদ। দুর্যোগের ঘনান্ধকারে যখনই যুবশক্তি বিভ্রান্তিতে পথ ভুলে বিপথে চলবে, তখনই এই বীর বিপ্লবীদের অমর কীর্তির অসম সাহসিক দুর্জয় অভিযানের কাহিনী চিরভাস্বর ধ্রুবতারার মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে হৃদয়ের রক্ত-লেখায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' যে গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল, তার মহান নায়ক সাধারণ রেটিংরা। "The greatness of a man is the greatness of his greatest moments." তাঁদের আদর্শকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের অতি-মানবীয় শৌর্য এবং বাস্তব বৈপ্লবিক পরিকল্পনা আমাদের কাছে এক জ্বলন্ত ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস কি শুধুই অতীতের কাহিনী? শুধুই ঘটনা-পঞ্জী? না। ইতিহাস আমাদের আত্মিক এবং

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ—যা আমাদের আত্মসচেতন করে, আত্মবিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি জাগতিক ঘটনাবলীর পারস্পরিকতা অনুধাবন করতে সহায়তা করে। ইতিহাসের বাস্তব মূল্যায়ন হয় এই বিষয়সমূহের আনুপূর্বিক বিবেচনার ভিত্তিতেই। 'নৌ-বিদ্রোহের' ইতিহাসও সেই জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

এখন থেকে পঁচিশ বছর পূর্বেও আমাদের দেশ ব্রিটিশরাজের অধীন ছিল। সেই ব্রিটিশ এদেশে আসে মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালে ব্যবসায় করবে বলে। ক্রমে তারা বসলো এখানে আসন পেতে। প্রথমে এই ব্যবসায়রত বণিকদের দেখা-শোনার জন্যে ব্রিটেন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালিক এক স্কোয়াড্রন্ যুদ্ধ-জাহাজ ক্যাপ্টেন্ টমাস্ বেস্টকে অধিনায়ক করে পাঠালেন এদেশে। এই জাহাজগুলোর নাম হলো,—'ড্রাগন্', 'ওসিয়েণ্ডার', 'জেমস্' ও 'সোলোমান্'। ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৬১২ সালে স্থাপিত হলো 'রয়েল্, ইণ্ডিয়ান্ নেভী'। সংক্ষেপে এর নাম হলো—'আর. আই. এন.'। পরাক্রান্ত মুঘলগণ ভারত শাসন করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরাজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন। বাধিত হলেন ক্যাপ্টেন্ বেস্ট। প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন্ বেস্ট তখন থেকেই সম্রাটের ক্ষমতার ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর নৌ-বাহিনীর জাহাজের কামান অতিসত্বর পর্তুগীজদের পরাভূত করলো। শুধু তাই-ই নয়, এই নৌ-সৈন্য ইউরোপীয় অন্যান্য ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগুলোকে এবং জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করে ইংরাজদের বাণিজ্য জাহাজ-গুলোকে অবাধে চলা-ফেরা করার সুযোগ করে দিতে থাকলো। পরে এই সৈন্যদের সাহায্যেই ভারতের বুকে ইংরাজরা নিরাপদে আসন বিছিয়ে বসলো। এই নৌ-বাহিনীর তখন নাম করা হলো—'এইচ. এম. আই. এন.' (হিজ ম্যাজেস্টিস্ ইণ্ডিয়ান্ নেভী)। ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত এই নামই প্রচলিত ছিল। মাঝে পাঁচবার এই নাম পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৩৪ সালে আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো—'রয়েল ইণ্ডিয়ান্ নেভী' (আর. আই. এন.)।

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করে ১৭৫৭ সালে ভারতে ইংরাজ-প্রভুত্বের সূত্রপাত হলো এবং তা পূর্ণক্ষমতায় বিকাশলাভ করলো বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশ (বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, ভুটান ও সিংহলসহ) ইংরাজের জাতীয় পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাকের' নীচে স্থানলাভ করলো ১৮৪৭ সালে। অর্থাৎ মহান ভারতবর্ষ পরাধীন হলো। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।"

ভারতে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভিযান শুরু হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালে, স্বাধীনতার বীর সৈনিক মঙ্গল পাঁড়ের নেতৃত্বে। যদিও তা ব্যর্থ হয়েছে, তবুও সে তার ছাপ রেখে গেছে। এটা নিশ্চিতই জানি, কোন কিছুই বৃথা যায় না। পেছনে সে ফেলে যায় তার পদ-চিহ্ন। তাই ঐ সিপাহী বিদ্রোহেরই সাতাশি বছর পরে (অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে) 'রয়েল ইণ্ডিয়ান্ নেভীর রেটিংরা (নৌ-সৈন্যদের রেটিং বলা হয়ে থাকে) আবার বিদ্রোহ ঘটায়। তারই জের চললো ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক অনেক আন্দোলন ভারতের বুকের ওপরে ঘটে গেছে। অনেক দেশপ্রেমিক ফাঁসি-কাঠে এবং ইংরাজ ও ইংরাজ-দালালদের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। আরও অনেক কিছু। তা বলতে গেলে বিরাট বিরাট বই হয়ে যাবে। থাক সে-কথা। শুধু তাঁদের স্মরণে বলব—বিপ্লবের সাধনায় সংগ্রামের জয়রথে যাঁরা মুক্তির নিশান উড়িয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে শৃঙ্খল-মুক্ত করার জন্যে স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের শত শত প্রণাম জানাই। শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর সেই নৌ-বিদ্রোহের কথাই আবার বলি। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, সেই নৌ-বিদ্রোহও ব্যর্থ হলো! তবে, একথা ঠিক,—ঐ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও

ব্রিটিশকে কিন্তু বাধ্য করেছিল ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে এবং তার নতুন পরিস্থিতিকে মেনে নিতে। কারণ, এই বিদ্রোহ ব্রিটিশের প্রতি নৌ-সৈন্যের তথা সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর আনুগত্যের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাই দেখা গিয়েছিল ঐ কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য দুই বাহিনীতে; অর্থাৎ স্থল ও বিমান-বাহিনীতেও দেখা দিয়েছিল বিদ্রোহ। ফলে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় খুবই তাড়াতাড়ি। নৌ-বিদ্রোহের দেড় বছর পরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য বিতর্কিত ভাগাভাগির মাধ্যমে আবার উদিত হলো।

পুরনো দিনের কথা হলেও মনে যতটা আছে তাই বলব। কেন নাবিক হয়েছিলাম, আর কী করে—প্রথমে সেই কথাই বলি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রধানত ভারতের পশ্চিমী অধিবাসীদের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো। কিন্তু অফিসার পদে নিয়োগ করা হতো ইংরাজদের। ভীষণ সঙ্কটের মুখে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত সরকার বাধ্য হলো ভারতের অন্যান্য জাতীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে লোক সংগ্রহ করতে। এই সময় থেকেই কিছু কিছু ভারতীয় লোক অফিসার পদেও স্থান লাভ করলো। হলে কি হবে, দেশের বৃহৎ জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হতো এই সেনাবাহিনীকে। এটা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে। সৈন্য সংগ্রহের সময়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হতো, কোন রাজনৈতিক স্পর্শ ঐ নিয়োগপ্রার্থী ব্যক্তির আছে কিনা। সংগ্রহকারী অফিসার প্রত্যেকের রাজনৈতিক বিশ্বস্ততা যাচাই করে দেখতেন। সামান্যতম রাজনৈতিক আলোচনাও সৈন্য-বিভাগে নিষিদ্ধ ছিল।

দেশের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল তাদের সেনাবিভাগে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য। এই অবস্থার মধ্যে অতীতে আমার কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকা সত্ত্বেও অতি সন্তর্পণে নিজ বাড়ির ঠিকানা পাল্‌টে দিয়ে নৌ-বাহিনীতে প্রবেশ করলাম পোর্ট অফিসার হয়ে।

আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, নৌ-বিদ্রোহের পিছনে কোন সংগঠিত প্ল্যান্-প্রোগ্রাম ছিল না অথবা রাজনৈতিক পার্টিগুলোর সহযোগিতায় সৈন্যবিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে আমাদের মহান ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার বা মুক্ত করানোর কোন অভিপ্রায় ছিল না। এটা কতখানি সত্যি সে বিষয়ে গভীর প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমি নিজের বেলায় বলতে পারি, ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন (যে আন্দোলনে যুক্ত থাকায় কারাদণ্ড ভোগ করেছিলাম), নেতাজীর "ভারতীয় জাতীয় বাহিনী"র (আই এন. এ —ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল্ আর্মি) "দিল্লী চলো" আন্দোলন প্রভৃতিও যখন ব্রিটিশকে ভারত থেকে তাড়াতে পারলো না, তখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে মিলিট্যান্ট্ টাইপের কর্মীরা কোন কোন রাজনৈতিক দলের মিলিত এক সর্বভারতীয় গোপন সংস্থার সিদ্ধান্ত মতো কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীতে) প্রবেশ করতে লাগলো। আমিও যোগদান করলাম তখনকার কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্ধনের নির্দেশে। শ্রীযুত পটবর্ধন এবং শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী তখন "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে অভিযুক্ত হয়ে পুলিশকে

এড়িয়ে আত্মগোপন করে চলছিলেন। আমি '৪২-এর আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করে কলকাতায় যখন এলাম তখন শ্রীযুত পটবর্ধন এবং শ্রীযুক্তা আসফ আলী আত্মগোপন করে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। সেটা ছিল ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস।

৭ই মার্চ রাত্রি সাড়ে সাতটায় শ্রীযুত পটবর্ধন অতি গোপনে মিলিট্যাণ্ট্ টাইপের কর্মীদের নিয়ে এবং বিশেষভাবে যাঁরা '৪২-এর আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের নিয়ে এক যুক্ত সভা ডাকলেন কলকাতার রসা রোডের নকীপুরের জমিদার বাড়িতে। ঐ বাড়িতে একটা এ. আর. পি. ওয়ার্ডেন পোস্ট ছিল। ঐ এ. আর. পি. ওয়ার্ডেন পোস্টের বেশির ভাগ কর্মীই ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য। সেখানে প্রবেশের পথে কড়া গার্ড রাখা হয়েছিল। সকলকেই ঐ গার্ডের কাছে পূর্ব-নির্দেশ মতো এক প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন দেখাতে হয়েছিল। ঐ সাংকেতিক চিহ্ন আর কিছুই নয়, তা ছিল সাদা স্ট্রাইপ যুক্ত পুরাপুরি নীল রঙের একখানা রুমাল থাকবে ডান হাতে, ভাবটা থাকবে এইরূপ যেন, নাক মোছা হচ্ছে। শ্রীযুত নিরাপদ দাস (কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য) আমাকে ঐরূপ একটা রুমাল দিলেন। তু'জনে একটু আগে-পরে সামান্য সময়ের ব্যবধান রেখে সময়মতো যথাস্থানে উপস্থিত হলাম।

আমার ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের তামাম শাসনের বনিয়াদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেওয়ার তুর্বার সঙ্কল্পের আগুন জ্বলছে। মনে মনে ভাবলাম, গভীর আত্মবিশ্বাস ও তুর্জয় সাহসে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে—প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ একদিন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ধ্বংসের কালানলে পরিণত হতে পারে। তার প্রমাণ আমরা কিছুটা পেয়েছিলাম ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর "আইন অমান্য" করে গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল ঢেউ-এর মধ্যে, যার ধাক্কায় ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের

নেতৃত্বে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" হয়। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত "টিটাগড় ষড়যন্ত্র" এবং এরই মধ্য দিয়ে পথ-পরিক্রমায় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করলো ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন—"ভারত ছাড়ো"। এই "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের পটভূমিকায় যে দৃশ্য ধরা পড়েছিল তাও ভাববার বিষয় হয়ে সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ জয়লাভের ফলে ভারতের অচলাবস্থা সমাধানের জন্যে ব্রিটিশ সরকার প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হন। ১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার (War Cabinet) সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ (Sir Stafford Cripps) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে এবং 'সরেজমিনে ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে' উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা 'তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে কিনা তা যাচাই করবার জন্যে' ভারতবর্ষে যাবেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ দিল্লীতে এসে পোঁছান এবং ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল করাচী হয়ে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্রিটিশ সরকারের এই খসড়া ঘোষণায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো ছিল ঃ

(১) "যুদ্ধ বন্ধ হবার সাথে সাথেই ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্য একটি নির্বাচিত সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

(২) "সংবিধান-রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি-নিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) "নিম্নেবর্ণিত সর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সংবিধানটিকে স্বীকার ও অবিলম্বে কার্যকরী করবে ঃ

(ক) "ব্রিটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ যদি নূতন সংবিধানকে স্বীকার করতে না চায় এবং স্বীয় প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক অবস্থা বহাল রাখতে চায় তবে তাকে সেই অধিকার দেওয়া হবে।

ভবিষ্যতে যদি সেই প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে চায় তবে তা সে করতে পারবে।

"আপাততঃ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে অনিচ্ছুক প্রদেশ যদি ইচ্ছা করে তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাদের জন্যে নূতন এক সংবিধান গঠনে সম্মত হবে, সেই সংবিধানে এই প্রদেশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অনুরূপ পূর্ণমর্যাদা দেওয়া হবে।

(খ) "সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা ব্রিটিশ সরকারের সাথে এক চুক্তি করবে, চুক্তিতে 'ব্রিটিশের হাত হতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরকরণের ফলে উদ্ভূত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে' ব্যবস্থা ও 'জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা-ব্যবস্থার' প্রতিশ্রুতি থাকবে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে 'ভবিষ্যতে ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সাথে স্বীয় সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় ইউনিয়নের ক্ষমতার ওপর কোন বাধানিষেধ আরোপিত হবে না।'

(৪) "প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর নিম্নসভাগুলির (Lower Houses) সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নির্বাচিত হবে।

(৫) "নূতন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু 'স্বদেশ, কমন্ওয়েল্থ এবং জাতিসংঘ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলির নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী অংশগ্রহণ' করাই ব্রিটিশ সরকারের 'কাম্য ও বাঞ্ছনীয়'।"

এই ঘোষণায় ভারতকে একটা আশ্বাসমাত্র দেওয়া হলো—সে আশ্বাসও আবার পূর্ণ হবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, ভবিষ্যতে। মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনাকে "ভবিষ্যতের তারিখ-যুক্ত চেক" (Post-dated Cheque) বলে অভিহিত করলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রদেশগুলির যোগদান না করবার ব্যবস্থা রাখায়

পাকিস্তানের দাবী সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যদি না-ও হয় তবে তাতে প্রত্যক্ষ-ভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে নিশ্চয়ই। তৃতীয়তঃ, প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের দাবী ছিল, ভারতীয় নেতৃবর্গ কর্তৃক গঠিত জাতীয় সরকারের পরামর্শে গভর্ণর-জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে কাজ করবেন, —এই মর্মে অলিখিত আশ্বাস। কিন্তু কংগ্রেস তা পেল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে ক্রিপস্ পরিকল্পনার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, "সরকারের বর্তমান কাঠামো অবিকল পূর্বের ন্যায় বজায় থাকবে, বড়লাটের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বহাল থাকবে এবং আমাদের মধ্যে জনকয়েক তাঁর উর্দিধারী হুকুমবরদার হয়ে ভোজনশালা ও ঐ জাতীয় ব্যাপারের তদারকী করবে।" সেই জন্যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। মুসলিম লীগও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের দাবীর পুনর্ঘোষণা করলো।

তাই, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যখন ভারত ত্যাগ করে গেলেন, তখন ভারত অদৃষ্টপূর্ব এক উত্তেজনায় কম্পমান। বিশেষতঃ, জাপান যখন ভারতের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে সেই সঙ্কট মুহূর্তেও ব্রিটিশ সরকার যখন আপস-মীমাংসায় রাজী হলো না, তখন কংগ্রেসও সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার নীতি গ্রহণে বিলম্ব করতে আর চাইলো না। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই "ভারত ছাড়ো" ("Quit India"),—এই ধারণা মহাত্মা গান্ধীর মনে উদয় হয় এবং অবিলম্বে তিনি একে জাতীয়তাবাদী ভারতের রণধ্বনি করে তোলেন। ১৯৪২ সালের ১০ই মে তারিখে তিনি "হরিজন" পত্রিকায় লিখলেন,—"ব্রিটিশের ভারতে অবস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানানোরই সামিল। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে গেলেই এই প্রলোভন বিদূরিত হবে...।" এর কিছুকাল পরে তিনি আবার লিখলেন, "ভারতকে ভগবানের হাতে, অথবা আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে

দিয়ে যান। তখন সমস্ত দল হয় নিজেদের মধ্যে কুকুরের মতো মারামারি করবে, না-হয় সত্যকার দায়িত্ববোধের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা করে ফেলবে···।"

১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হলো যে, ব্রিটিশের শাসন-ক্ষমতা ত্যাগের দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ব্যাপক' অহিংস সংগ্রাম শুরু করতে কংগ্রেস 'অনিচ্ছুক হয়েও বাধ্য' হবে। এই প্রস্তাব ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হলো। সেখানে ঘোষণা করা হলো ঃ

"ভারতের স্বার্থে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সার্থকতার জন্যে ভারতে অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার জরুরী প্রয়োজন। এই শাসন চালিয়ে যাওয়ার ফলে ভারত হীনমন্য ও দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ইহারই ফলে দেশরক্ষায় এবং পৃথিবীর মুক্তিসংগ্রামে যোগদান সম্বন্ধে ভারত ক্রমশঃই অপারগ হয়ে পড়ছে।"

পরদিন সকালে (১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট) মহাত্মা গান্ধী-সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবর্গ এবং বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। সাথে সাথে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হলো। লর্ড লিন্‌লিথগো (ভারতের বড়লাট) ইচ্ছাকৃতভাবে সারা ভারত জুড়ে কঠোর দমননীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের নেতা বলতে কেউ থাকলেন না এবং সরকারের হিংস্র অত্যাচারে জনসাধারণ চরম ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ পেল। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেতৃহীন জনতার সহিংস সংগ্রামের পূর্ণ কাহিনী এখনও পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী ২৫০টি রেলস্টেশন ও ৫০০টি ডাকঘর হয় ক্ষতিগ্রস্ত, না-হয় ধ্বংস করা হয়েছে ; ১৫০টির অধিক থানায় আক্রমণ চালানো হয়েছে, বেশ কিছু-সংখ্যক

রাজকর্মচারী ও সৈন্য নিহত হয়েছে এবং ৯০০ জনের অধিক নাগরিকের প্রাণ গিয়েছে। (এই হিসাব ব্রিটিশের সুবিধা মতো পরিবেশিত, অতীব নগণ্য। যা ঘটেছিল, তার দশভাগের একভাগ মাত্র। '৪২-এর "আগস্ট আন্দোলন"-এর পরিচালন ভার যে সর্বভারতীয় কণ্ট্রোল্ কমিশনের পাঁচজন সদস্যের ওপরে ছিল, তাঁরাই তা ভালোভাবে জানেন। তাঁদের মধ্যে মনে হয় তিনজন এখনও বর্তমান। তাঁরা হলেন, শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীযুত পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী। তাঁরাই পারেন প্রকৃত তথ্য-সম্বলিত ঘটনাপঞ্জী লিখতে।)

অবশ্য মহাত্মা গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন না। ১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি হতে তিনি তিন সপ্তাহ অনশন করে রইলেন। তাঁর জীবন যখন ঘোরতর সঙ্কটাপন্ন তখনও তাঁকে মুক্তিদানে লর্ড লিন্‌লিথগোর অস্বীকৃতির দরুন দু'জন হিন্দু এবং একজন পার্শী বড়লাটের শাসন-পরিষদ হতে পদত্যাগ করলেন। এর পরেই ১৯৪৩ সালে বাংলায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এটাও ব্রিটিশের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। এই দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোকের প্রাণ গেল এবং ১১৭৬ বঙ্গাব্দের (ইং ১৭৭০ সাল) কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' বিভীষিকা নূতন করে বাংলাদেশে দেখা দিল। দেশের অস্থির ও চাঞ্চল্যকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমিকায় আমরা মিলিত হয়েছিলাম ঐ রসা রোডের জমিদার বাড়িতে।

আমরা যে ঘরটায় বসেছিলাম সেটা ছিল একটা বড় হলঘর। দরজা-জানলা বেশির ভাগই বন্ধ ছিল। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে। আলো ঝলমল করছে। এক-এক করে দেখতে দেখতে দেড়শো যুবক উপস্থিত হলাম। সকলেরই মানসিক অবস্থা ছিল যেন,—এই মুক্তিসেনার দল, যারা স্বাধীনতার স্বপ্নে মুক্তিনেশায় উন্মত্ত, প্রাণের বিনিময়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তারা যে-কোন সময়ে প্রস্তুত। যারা আঘাত হানবার জন্যে

দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধেছে, শৃঙ্খল ভাঙবার উন্মাদনায় যারা অধীর —তারা কংগ্রেসের নৈতিক চেতনা বা অহিংস-নীতির চুলচেরা বিচারে আগ্রহী নয়; পরাজয়ের গ্লানিকে তারা কিছুতেই মানতে পারে না। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র। সকলেই সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। সৈনিকের কাছে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির নির্দেশ। সেখানে সৈনিকের মনে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই, কোন তর্ক, কোন অক্ষমতার বা দ্বিধার স্থান সেখানে নেই,— যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের একমাত্র কর্তব্য সেনাপতির আদেশ পালন করা আর প্রয়োজনমতো শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুবরণ করা। যুদ্ধের তাই নীতি হলো ঃ

> "There's not to make reply,
> There's not to reason why,
> There's but to do and die."

আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি-তুল্য শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্ধন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাড়ে সাতটায় এসে হলঘরে উপস্থিত হলেন। তিনি হলঘরে প্রবেশের সাথে সাথে সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সম্মান দেখাবার জন্যে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। পূর্বেই তাঁর বিষয়ে অনেক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্মান পাবার উপযুক্তও বটে। তিনি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। শ্রীযুত হরিদাস মুখার্জী তা বাংলায় তর্জমা করে দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা হলো, "ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে ভারতের বীর জনগণ অশেষ দুঃখ অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন, বর্তমানেও করছেন। '৪২-এর আন্দোলনের জের এখনও চলছে। সর্বোপরি নেতাজী বাইরে গিয়ে যে-চেষ্টা করছিলেন ভারত-মাতাকে মুক্ত করতে, তা এখনও কার্যকরী হয়নি। তিনি (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু) চান, আমরা যারা ভারতে আছি, আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বেশি বেশি করে

প্রবেশ করা এবং সেখানে বিদ্রোহ ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা। তাই, আমি আবেদন রাখছি, আপনারা দলে দলে মিলিটারীতে যোগদান করুন, ভারতমাতাকে মুক্ত করুন। আপনারা মনে রাখবেন, এই ব্যাপারে আমাদের পার্টিই শুধু এই সিদ্ধান্ত নেয়নি, অন্যান্য অনেক পার্টি,—যেমন কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, মুসলিম লীগ, এমনকি কম্যুনিস্ট পার্টিও আছে।"

কম্যুনিস্ট পার্টির কথা ওঠায় অনেকেই আশ্চর্য হলেন। অনেকেই তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। কেননা, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তখন তাঁদের পার্টিগত নীতিতে ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হলো, তখন থেকে তাকে 'জনযুদ্ধ' (People's War) বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশকে কতকটা পরোক্ষে সাহায্য করতে থাকেন। এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁরা কি করে মিলিটারীতে লোক ঢুকিয়ে বিদ্রোহ ঘটাবেন ? প্রশ্ন জাগলো।

শ্রীযুত পটবর্ধন বললেন, "ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যদিও নীতিগত-ভাবে এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করেছেন, তবুও তাঁরা ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের সময়ে সেখানকার সেনাবাহিনী কিভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল, তা তাঁরা ভোলেননি। আমাদের সাথে কথাও হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আমরা সমস্ত পার্টি মিলে একটা সংস্থাও গঠন করেছি। তা গোপনীয়তা বজায় রেখেই চলবে। এতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও থাকছে। এই গোপন সংস্থার কাজই হবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেশের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে ভারতে বিপ্লবী সরকার তৈরী করা। নেতাজীও এটাই চাইছেন।" এরপরে শ্রীযুত পটবর্ধন সাংগঠনিক পদ্ধতির কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, "সেনাবাহিনীতে ঢোকার জন্যে আমরা প্রধান প্রধান শহরে কতকগুলো গোপন আস্তানা খুলেছি। আপনাদের পৃথক পৃথক-ভাবে সেখানে নিশানা নিয়ে যেতে হবে। সেই নিশানাসহ ঠিকানা

স্থানীয় পার্টির সম্পাদকের কাছে অথবা তাঁর (সম্পাদকের) নিকটতম প্রতিনিধির কাছে পাবেন। একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, এই ব্যাপারে আমাদের সর্ববিষয়ে কঠোরভাবে গোপনীয়তা পালন করতে হবে, যেমনভাবে করেছিলেন অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবীরা।" আবার তিনি বললেন, "যাঁরা '৪২-এর আন্দোলনে অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন, তাঁদের নিজ বাড়ির ঠিকানা পাল্‌টে দিয়ে গোপন সংস্থা যে ঠিকানা দিয়ে দেবেন তাই-ই ফর্মের কলাম-এ বাড়ির ঠিকানা বসিয়ে দেবেন।" এইরূপে নির্দেশ দান করে তিনি সাড়ে ন'টায় সভাস্থল ত্যাগ করে তাঁর গোপন আস্তানায় চলে গেলেন।

মনে হলো, দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের মহামুক্তির সঙ্গীতসুধা তিনি স্থির বিশ্বাসে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে পান করেছেন। বিপ্লবীরা জানতেন, এ-সংগ্রাম বড় কঠিন, বড় ভয়াবহ।

সমগ্র দেশটা যেন ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে মরণ-পণ সংগ্রামে লিপ্ত। বন্ধন-মুক্তির প্রদীপ্ত আহ্বানে বাংলার ক্ষাত্রবীর্য উজ্জীবিত। তেজোদ্দীপ্ত রুদ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো ঃ

"নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি ?
দে-রে দেখি, ভীম কারার এ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার, ভাঙরে তালা !
যত সব বন্দিশালায়—আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্‌ উপাড়ি।"

তাই মিলিটারীতে ঢোকার উদ্দেশ্যই হলো,—ব্রিটিশকে তাড়াতে হলে এবং ভারতমাতাকে মুক্ত করতে হলে এখন একমাত্র পথ, ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানো। কেননা, এই

সেনাবাহিনী দ্বারাই ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে এখনও পদানত করে রেখেছে। যদিও বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ভারতের লোকই বেশি, তবুও সামরিক বিধি-বিধানের অক্টোপাসে ঐ বাহিনী এমনভাবে আবদ্ধ যে, সম্পূর্ণভাবে তারা (সৈন্যরা) ভারতীয় জনগণের তথা জাতীয় নেতাদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ, বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়ার মতো। শুধু চাই একটু সংগঠিত যোগাযোগ, একটু রাজনৈতিক ছোঁয়াচ এবং প্রয়োজনের সময়ে সংগঠিত ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। একথা ঠিক যে, সৈন্য-বিভাগের বেশির ভাগ লোক রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিল না। আর, ছিল না বলেই তো গোপন সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বস্ত, মোটামুটি রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন বেশ কিছু লোক ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন বিভাগেই বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছিল। সে সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত-সংখ্যক ভারতীয় লোক ছিল (মনু সুবাদারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লিতে যুদ্ধের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ পি. ম্যাসন্ বলেন) ঃ

(ক) স্থল-বাহিনীতে ভারতীয় মোট সংখ্যা ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার,
(খ) নৌ-বাহিনীতে " " " ৩২ হাজার ৯ শ' ১৭ এবং
(গ) বিমান-বাহিনীতে " " " ২৯ হাজার ৮ শ' ২০।

আজ বলতে বাধা নেই, ঐ গোপন সংস্থার মাধ্যমে স্থল-বাহিনীতে ঢোকানো হয়েছিল ৪ হাজার ৫০০ জনকে; নৌ-বাহিনীতে ৩ হাজার এবং বিমান-বাহিনীতে ১ হাজার ৫০০ জনকে। প্রয়োজনের তুলনায় অবশ্য খুবই নগণ্য। তা ছাড়া এখন এও বলতে বাধা নেই, ঐ কেন্দ্রীয় গোপন মিলিত সংস্থার সদস্য ছিলেন (গোপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমি যতটা জানি),—শ্রী এইচ.

এস. ঘোষাল (শ্রীহরিসাধন ঘোষাল, যিনি পরে বার্মায় পালিয়ে গিয়ে রেড্-আর্মি পরিচালনা করেন) ; শ্রীচন্দ্র সিং গাড়োয়াল, শেখ শাহাদত আলী, শ্রীভুলাভাই দেশাই, শ্রীঅচ্যুত পটবর্ধন, শ্রী আর. এস. রুইকর, ডঃ জি. অধিকারী, ডঃ ইউসুফ্, শ্রীমতী কমলা ডোণ্ডে এবং আরোও দু'একজন, যাঁদের নাম আমি জানতাম না। তবে, ঐ নাম-না-জানাদের মধ্যে একজন মিঃ পি. কোট্টায়াম ছিলেন যাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল মুলতান্ মিলিটারী জেলে।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাস। এই সময়টি আমার কাছে এক স্মরণীয় বিষয় হয়ে আছে। আমার ওপরে নির্দেশ এলো, আমাকে নৌ-বাহিনীতে ঢুকতে হবে—তা সে যেভাবেই হোক। একটু চিন্তায় পড়লাম। বিশেষভাবে চিন্তিত এই জন্যে যে, অতীতে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় "টিটাগড় ষড়যন্ত্র" মামলায় (যে মামলায় আমাদের গোটা পরিবারই গ্রেপ্তার বরণ করেছিল। কেননা, আমার আপন বড়দাদা শ্রীযুত কালীপদ ভট্টাচার্য ঐ মামলার একজন নেতৃস্থানীয় আসামী ছিলেন) এবং ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ করি ও দণ্ড ভোগ করি। এই সবের রেকর্ড ভারত সরকারের হেফাজতে নিশ্চয়ই থাকবে। অথচ মিলিটারীতে ঢুকতে হলে কোনপ্রকার রাজনৈতিক ছোঁয়াচ থাকলে চলবে না। মহাসঙ্কটে পড়লাম। সঙ্কট দেখা দিল এই ভেবে যে, বাড়ির ঠিকানা পাল্টে দিয়ে ঢোকার নির্দেশ পেয়েছি বটে, কিন্তু মিলিটারীতে যে উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি, তা ওখানে বেশিদিন থেকে সিদ্ধ করতে পারবো তো? তাড়াতাড়ি পুলিশের হাতে বা মিলিটারীর মধ্যে যে গুপ্তচর-বাহিনী আছে তাদের কাছে ধরা পড়ব না তো? এই সব নানা প্রকার এলোমেলো চিন্তা

আমার মধ্যে এসে ভিড় জমাতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মনকে স্থির করলাম এই ভেবে যে, যা-ই ঘটুক না কেন, আমি আমার পরম আদরের ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রকার বিপদের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকব। বিশেষ করে আমি তো 'ডু অর ডাই' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি। অতএব চিন্তার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। স্থানীয় পার্টির সম্পাদকের কাছ থেকে গোপন আস্তানার' ঠিকানা এবং সাঙ্কেতিক নিশানা জেনে নিয়ে ২২শে মার্চ সকালে ৭৫নং হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড—কলকাতা) বাড়িতে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা অফিসের সামনে সাঙ্কেতিক নিশানাসহ এসে উপস্থিত হলাম। এক্ষেত্রে সাঙ্কেতিক নিশানা ছিল, সেই নীল রঙের রুমাল বুক পকেটে থাকবে যার একটা কোণ অন্ততঃ দেড় ইঞ্চি বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকবে। ঐরূপে নির্দেশিত পথে আমি পকেটে রুমাল রেখে হ্যারিসন রোডের ৭৫ নম্বর বাড়ির গেটে হাজির হলাম। দু'জন যুবক (যাদের আমি চিনি না) পাহারা দিচ্ছিলেন গেটে। আমাকে সাঙ্কেতিক নিশানা ঠিক-ঠিকমতো পেয়ে কোনরকম প্রশ্ন না করে কানে কানে বলে দিলেন, সোজা চলে যান তিন তলায় দু'নম্বর ঘরে। তাদের কথামতো এসে হাজির হলাম দু'নম্বর ঘরের সামনে। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। আস্তে আস্তে পূর্ব-নির্দেশ মতো দরজার গায়ে তিনটে টোকা মারতেই দরজা ভেতর থেকে খুলে দেল। দেখলাম, দরজার পাশে এক মহিলা বসে আছেন। তিনি বললেন, সামনের পর্দাটা তুলে ভেতরে যান। তাঁর কথামতো সেখানে গিয়ে দেখলাম, জন পাঁচেক লোক বসে আছেন। তাঁরা আমার পরিচিত ছিলেন না। আমার কাছে স্থানীয় পার্টি সম্পাদকের লিখিত ঠিকানাটা চাইলেন। অর্থাৎ আমি যে সেই প্রেরিত ব্যক্তি, তার পরিচয়পত্র হলো ঐ স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের নিজের হাতে লেখা ৭৫নং হ্যারিসন রোডের ঠিকানাটা আমার কাছে থাকা চাই-ই।
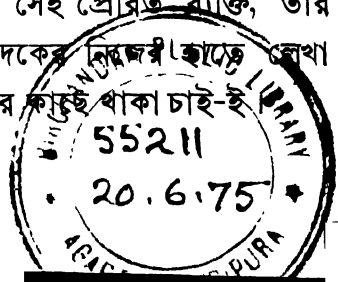
বিপ্লবীদলের সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো। এখানেও সেই গোপনীয়তার পরীক্ষা চললো আমার ওপরে। কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটি কর্মীকে। এ যেন সেই মৌরলা মাছ ধরার জাল। একেবারে ছেঁকে তোলা হচ্ছে। কেউ ফাঁকি দিয়ে পালাতে না পারে—তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি। আমি সেই লিখিত ঠিকানাটা দিলাম।

ঘরটি খুব বড় নয়। তবে একসঙ্গে ২৫।৩০ জন লোক বসতে পারে। ফেমিলি কোয়ার্টারের মতোই সাজানো-গোছানো। আলনা, ড্রেসিং-টেবিল থেকে শুরু, মায় রেডিও পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে দেখা গেল। ঘরের উপরের দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল, অনেকগুলো ফটো রেলিং করে সাজানো রয়েছে। ফটোগুলো দেখে নিশ্চিতই ধারণা হবে যে, ঐ ঘরটি বা ঐ ঘরের পরিবার-পরিজন একান্তই পরম ব্রিটিশভক্ত। তার ভেতরে এতটুকু ঘাটতি নেই। মনে মনে ভাবলাম, ব্রিটিশকে ফাঁকি দেবার বাঙালীর কী অভিনব ব্রেন্! বিশেষ করে আমি যখন সন্ত্রাসবাদী দলে (ভারতীয় অনুশীলন পার্টিতে) ছিলাম, যদিও আমি তখন ছোট ছিলাম, তখনকার যুগের সেই 'গুপ্তীমন্ত্র'-এর নিশানা অনেক কিছুই জানতাম। তার কারণও ছিল,—তখন আমাকে দিয়ে বেশির ভাগ সময়ই 'ক্যুরিয়ার'-এর করণীয় কাজগুলো করানো হতো। তাতে আমি জানি কী কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে ৩।৪ ঘণ্টা পর পর পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টে নিয়ে আমাকে চলতে হতো। সে অতীত সত্যিই স্মরণীয়!

যে পাঁচজন ওখানে বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রৌঢ় বয়সের, আর বাকী দু'জন ছিলেন যুবক। তিনজন প্রৌঢ়ের মধ্যে একজনকে দেখাচ্ছিল (তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে) যেন কোন স্কুলের হেডপণ্ডিত। অর্থাৎ কোন স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক। অথচ তিনিই হলেন মূল। আমার খাঁটি নাম-ধাম লিখে নিয়ে এবং আমার

অতীতের রাজনৈতিক কার্যকলাপের নোট রেখে বললেন, "আপনার নিজের নাম এবং বাবার নাম ঠিক রেখে বাড়ির ঠিকানা পাল্‌টে দিয়ে ২৪-পরগনার এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেবেন বাড়ির ঠিকানা বসাবার জায়গায়। মনে রাখতে হবে যে, গোপনীয়তা প্রাণ গেলেও বজায় রাখতে হবে। শত্রুরা কিন্তু ওৎ পেতে আছে আমাদের ধরে ফেলবার জন্যে।" মনে হলো, তাঁরা যেন আগে-ভাগেই সব ঠিক করে রেখেছেন। আমার তখন বয়স সবে ২২ বছর। আমাকে আগামী কাল সকাল ১০টার মধ্যে সেনাবাহিনীর রিক্রুটিং সেণ্টারে যেতে বললেন নৌ-বাহিনীতে ভর্তি হবার জন্যে।

মনে হলো যেন, মহান বিপ্লবী শহীদদের অমর আত্মা হঠাৎ আমার কানে কানে ঝঙ্কার তুলে বাণী শুনিয়ে গেল,—"দেশের মুক্তিযজ্ঞের যূপকাষ্ঠে আত্মোৎসর্গের গৌরব ঘোষণা করেই হবে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। লৌহকারায় অবরুদ্ধ সঙ্কুচিত ভীত জীবনে মরণের মহাশঙ্খ ধ্বনিতে শুনবে জাগরণের জয়গান,—শৃঙ্খল-মুক্ত জীবনে লাগবে বাঁচার দীপ্ত পরশ, মুক্তদীপ্ত প্রাণ ছুটে যাবে মরণকে আলিঙ্গন দিতে,—এ জীবন-মরণের মোহনা থেকে শুরু হবে আমাদের জীবনের জয়যাত্রা। মনে রাখতে হবে, সংগ্রামের দুর্গম পথে যাত্রার পূর্বে মুক্তিসেনারা এই সঙ্কল্পে নিজেদের দীক্ষিত করে নিতেন।"

আনত শিরে আমিও দীক্ষিত হলাম মহামন্ত্রে। কারণ, বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান লক্ষপ্রাণের চিরনিবেদনও সমাহারের স্তরে পৌঁছায় না। সেখানে শত্রুর সঙ্গে আপসের কোন পথ খোলা থাকে না—সেখানে একমাত্র সমাধানের পথ—সংগ্রাম। শত্রুর সঙ্গে আপস একমাত্র মৃত্যুতে, বেঁচে থাকতে নয়। শোণিত লেখায় একদল ইতিহাস সৃষ্টি করে যায়, অন্যদল পথ বেঁধে যায়, উত্তরসূরীরা সেই পথে রক্তের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলে, একই পথের ওপরে কখনও ঘুরে-ফিরে পাক্ খায় না—পাঁয়তারা কষে না। বিপ্লবী-

ঐতিহ্য যাদের হাতছানি দিয়ে ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট কাঁটাপথে টেনে নিয়ে যায়, যারা আদর্শের হোমাগ্নি-শিখায় যাত্রাপথকে আলোকিত করে, তাদের উত্তরসাধকেরা যাত্রার শেষ কোথায় তা না জানলেও কখনও মধ্য অঙ্কে অভিনয় শেষ করে না। তা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। তাই পরের দিন সকালে ছুটে গেলাম সেনাবাহিনীর রিক্রুটিং সেণ্টারে। আবার মনে পড়ে গেল চিরস্মরণীয় মহান বীর বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের কথা। তিনি বলেছিলেন,—**"The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dying ourselves."**

২৩শে মার্চ, ১৯৪৩ সাল। কোনরকমে মুখে কিছু গুঁজে তাড়াহুড়ো করে সকাল ১০টার মধ্যে মিলিটারী রিক্রুটিং সেণ্টারে এসে উপস্থিত হলাম। বিরাট তাঁবুর প্যাণ্ডেল করে (বর্তমানে যেখানে গান্ধীজীর প্রস্তর-মূর্তি শোভা পাচ্ছে সেই চৌরঙ্গী-পার্ক সার্কাস রোডের মোড়ের গা ঘেঁষে একটু উত্তর-পশ্চিম দিকে বড় মাঠে) কর্ণেল মিঃ লাহিড়ী বসে আছেন। কিছু কিছু চেলা-চামুণ্ডাও বসে আছে তাঁকে ঘিরে। বিস্তীর্ণ তাঁবুর প্যাণ্ডেল ক্ষুধার্ত-শীর্ণ ১৮ থেকে ২১।২২ বছরের যুবকদের দ্বারা পূর্ণ। তিলধারণের জায়গাও নেই। কিছু কিছু ভাল স্বাস্থ্যের যুবকও ছিল। ঐ বয়সের মেয়েদের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁবুটা ভরে গেছে সৈন্যবিভাগে কর্মপ্রার্থীদের দ্বারা। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের ছাপ ঐ বিরাট তাঁবুর গায়ে এসে লেগেছে। দূর থেকে বিরাট তাঁবুর প্যাণ্ডেল যেন বলছে,—"পঞ্চাশের মন্বন্তর তো তোদের এই প্যাণ্ডেলে নিয়ে আসার জন্যই। আমার ক্ষুধা যে তোদের চেয়ে অনেক বেশি। তোদের তপ্তরক্তই পারে আমার এই বৃহৎ ক্ষুধাকে মেটাতে। আয়, তাড়াতাড়ি চলে আয়। আমি যে অস্থির—উন্মত্ত!"

[বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর শাসনকালে ১৯৪৩ সালে বাঙলায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে বহুলক্ষ লোকের প্রাণ যায় এবং ১১৭৬ সালের (ইং ১৭৭০ সাল) কুখ্যাত "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"-এর বিভীষিকা নতুন করে বাঙলা দেশে দেখা *দিয়েছিল,—একথা পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে।*]

বেলা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। সকলেই উদ্‌গ্রীব। অনেকেই ক্ষুধায় কাতর। বেলা ১টা নাগাদ কর্ণেল লাহিড়ী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "যাদের যাদের ক্ষিধে পেয়েছে তারা বেশি বেশি করে জল খেয়ে এসো।" কাছেই জলের কল ছিল। অনেকেই পেট ভর্তি করে জল খেয়ে নিল। আমিও খেলাম। পরে বুঝতে পারলাম এই জল খাওয়ার উদ্দেশ্য কি। সামরিক বিভাগে চাকরি নিতে হলে কমপক্ষে ১ মণ ৫ সের (পূর্বের হিসাব মতো) শরীরের ওজন থাকা চাই-ই। তা না হলে চাকরি হবে না। ঐ জল খাওয়ায় যার যেটুকু ওজনের অভাব ছিল তা পূর্ণ হলো। সবাই যখন এসে গেল, কর্ণেল লাহিড়ী সকলকে লাইন করে দাঁড়াতে বললেন। মেয়েদের আলাদা লাইনে দাঁড়াতে হবে। মৃত্যুপণ করা তরুণ দল,—"কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি" করে যেন লাইন করে দাঁড়াতে ব্যস্ত। সবাই লাইন করে দাঁড়ালাম। তিনি (মিঃ লাহিড়ী) সবার সামনে এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এই হলো প্রাথমিক পরীক্ষা। পরে এক এক করে 'ওয়েট মেশিনে দাঁড়িয়ে শরীরের ওজন দিতে বললেন পায়ের জুতো খুলে রেখে। সকলের ওজন লিখে নিলেন তিনি। কিন্তু, কি আশ্চর্য, তিনি কোন প্রার্থীকেই নিরাশ করলেন না। সত্যিই অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা এতটা আশা করিনি। অথচ তিনি একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার, 'কর্ণেল লাহিড়ী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সকলকেই নিয়ে নিলেন এবং তাঁর সিলেকসনই ফাইনাল।

আমি এমন অনেক প্রার্থীকেই দেখেছি যে, সামরিক বিধি-অনুসারে তাদের চাকরি হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যের দিক থেকে। কর্ণেল লাহিড়ী তাদের বাঁচিয়ে দিলেন।

এর পরেই এলো ফর্ম-ফিল-আপের পালা। কর্ণেল লাহিড়ী প্রত্যেকের হাতে একটা করে ফর্ম দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "আমি এক নম্বর দু' নম্বর করে চেঁচিয়ে বলতে থাকব কোথায় কি ভাবে লিখতে হবে। তোমরা সকলে সেই মতো সতর্ক হয়ে ফর্মের ঘরগুলো পূর্ণ করে নিজের হাতে সই করে আমাকে ঐ ফর্মটি আবার ফেরত দিয়ে দেবে।" তিনি চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন। আর আমরা সেই মতো ফর্ম পূরণ করে নিজ হাতে সই করে তাঁর কাছে ফেরত দিয়ে দিলাম।

বেলা পড়ে এসেছে। প্রায় ৪টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়মের হেড-কোয়ার্টারে আমাদের নিয়ে গেলেন মেজর-জেনারেলের কাছে এবং বললেন, "অল্, ও-কে।" আমাদের সবাইকে ফোর্টের রেস্ট হলে বসানো হলো। ভেতরে আমাদের জন্যে সবাই যেন ব্যস্ত। সর্টিং হচ্ছে প্রত্যেকের বিভাগগুলো এবং র‍্যাঙ্কগুলো। বলা বাহুল্য পূর্বে একই জায়গায় বসে স্থল, নৌ এবং বিমান-বাহিনীর লোক রিক্রুট করা হতো। অন্ততঃ ঐ সময়ে তাই দেখেছি। বর্তমানে তা আলাদাভাবে পৃথক পৃথক স্থানে হচ্ছে। অবশ্য ট্রেনিং-এ সকলকেই থাকতে হবে।

ফোর্ট উইলিয়মের শোভা দেখছি। স্পষ্ট দেখা যায় হলঘর থেকে। সত্যিই দেখবার মতো। মনে পড়ে গেল ফোর্ট উইলিয়মের ইতিহাস। আর ভাবছি, আমি আমার দেশেই আজ পরবাসী। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেসে উঠলো দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মূর্তি। মনে হলো, জাতির আত্মিক বল যেন জেগেছে। দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে বিপ্লবীদের কী দুঃসাহসিক পরিকল্পনা! জাতির অমিত-প্রাণ এই মুক্তিপাগল তরুণেরা বিদেশী দস্যুদের প্রভুত্বের ক্ষুধিত

লালসাকে মৃত্যুর কালানলে পুড়িয়ে মারতে চায়। কবিও বলেছেন,—

"ওরা দু'পায়ে দলে মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।"

রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, পৃথ্বীরাজ, পুরুর বীর আত্মা তো মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলালকেও জন্ম দিয়েছিল। পরিশেষে নেতাজীও তো মহান বিপ্লবের ও বীরত্বের গরিমায় অগ্নিশিখা জ্বেলে রেখেছেন। জাতির স্বার্থে তাঁদেরই তো আমরা বংশধর। নিশ্চয়ই, আমাদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে বইকি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রক্তে তর্পণ করব আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর শহীদদের শান্তির জন্যে—দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মবিসর্জন দিয়ে। অতীতের ভুলভ্রান্তির, জাতির ক্ষমাহীন কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত করব,—এই প্রতিজ্ঞা এই মৃত্যুপণ সঙ্কল্প আমাদের অন্তরে। তাই সংগ্রামের প্রাক্-ঐতিহাসিক মুহূর্তে সঙ্কল্প নিলাম এবং তা আমার উদাত্তকণ্ঠে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হয়ে বেরিয়ে এলো,—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

হঠাৎ এই সুখ-স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে একজন ল্যান্স্ নায়েক হাঁক্ দিল,—চা-পাটি খেয়ে নাও। দু'টো করে পরোটা ও এক মগ করে চা পাওয়া গেল। ক্ষিধের জ্বালায় আমরা অনেকেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। পরোটা দু'টো গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে আরামে চা পান করতে লাগলাম।

সন্ধ্যা নেমে এলো ফোর্ট উইলিয়মের মাথায়। আলো-ছায়ার মাঝখানে দূর থেকে রূপসী গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছিল। ফোর্ট

উইলিয়মের পরিণত বৃক্ষগুলো যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু সে তো মায়াবিনী, মায়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখে, সহসা ধরা দেয় না। একেই হয়ত বলা হয়ে থাকে নিয়তির খেলা।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় মিলিটারী ট্রাকে করে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাওড়া রেল স্টেশনে মিলিটারী ট্রেনে তোলা হলো। জানি না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। সামরিক বিধি-আইনে পূর্বে কোন খবর নেওয়া বা দেওয়া আইন-বিরুদ্ধ কাজ। তবে গুপ্তচর-বাহিনীর বেলায় আলাদা নিয়ম আছে। মিলিটারী ট্রেনখানা ঘন অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে। কত নদ, কত নদী; কত গ্রাম, কত শহর ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার সাথে সাথে ছুটছে। কিন্তু তারা পেছনেই পড়ে থাকলো। সেই ট্রেনকে ধরতে পারলো না। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছি। অব্যক্ত অসীম উদার নৈসর্গিক প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করছি। অন্ধকার অসীম সত্ত্বা আজ আমার কাছে সসীম হয়ে যেন ধরা দিতে চাইছে। অজানারও যে আনন্দ আছে 'তা এবারে আমার কাছে ধরা পড়লো।

তিনদিন ধরে একনাগাড়ে ট্রেন চলেছে। বিরতি কোথাও পেলাম না। ট্রেনে দু'বার করে খাবার দেওয়া হচ্ছে। সেই একই খাদ্য যা পেয়েছিলাম ফোর্ট উইলিয়মে। চতুর্থ দিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ, ১৯৪৩ সালের ভোর বেলায় আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছলো বোম্বেতে। সেখানে থেকে মিলিটারী ট্রাকে করে আমাদের শহরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নৌ-বাহিনীর ক্যাসেল্ ব্যারাকে। ভোরের আবছা আলোতে ছিম্‌ছাম্ শহরটিকে দেখতে পেলাম। রাস্তায় তখন সবেমাত্র দু'একজন করে লোক নেমে এসেছে। সকলেই মিলিটারীর আত্ম-গরিমায় ভরা জাঁকজমক দেখতে দেখতে পথ চলেছে। আর মনে মনে ভাবছে হয়তো তাদের অদৃষ্টের কথা। কিন্তু হেসেছিল রাস্তার ওপরে দাঁড়ানো ইটের-পাঁজরের শক্ত

দেয়ালগুলো। মনে হলো, তারা যেন বলছে, দেয়ালের লিখনগুলো ভালো করে পড়বে। কাল চলে কালের স্রোতে মহাকালে মিলিত হবে বলে। মহাকাল যে তোর সম্মুখে!

ট্রেনে বসে কিছু কিছু আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সম-আদর্শে বিশ্বাসী দু'একজন বন্ধুও জুটে গেল। শ্রীযুত এস. সি. ধর (শ্রীযুত সুবল চন্দ্র ধর, জুনিয়ার কম্যাণ্ডিং অফিসার)-এর সাথেই আমি বেশি করে যোগসূত্র রাখতে লাগলাম। পূর্বেই বোধহয় আমাদের আগমনের খবর দেওয়া হয়েছিল। নতুবা সময়মতো বেলা ১১টায় এতগুলো লোকের খাবার পেলাম কি করে? খাবার যে নিকৃষ্ট ধরনের তার প্রমাণ প্রথমেই পেয়ে গেলাম।

ক্যাসেল্ ব্যারাকে বড় বড় হলঘর। এক-একটা ঘরে আড়াই শো থেকে তিন শো করে লোক ধরে। আমার আস্তানা একটা হল-ঘরে ঠিক করে নিয়ে খাটিয়ার ওপরে আরাম করে বসে পড়লাম। আমরা নতুন লোক, নতুন পরিবেশে এসে পড়েছি। তার ওপরে মিলিটারীর নিয়ম-কানুন বিষয়ে আমরা তো একেবারেই নবীশ। কখন কি আদেশ আসবে, তার অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। তবে ভরসা এইটুকু যে, আমাদের এখন ট্রেনিং পিরিয়ড্ চলছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী বাহিনী করে নিশ্চয় এখনই পাঠাবে না। তা হতে পারে ব্যাটল্ ফিল্ড্ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে। তার এখনও সাত-আট মাস বাকী।

ক্রমে ক্রমে একজন-দু'জন করে লোকের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করছি। অবসর সময়ে ঘুরে ঘুরে ব্যারাকের অভ্যন্তরের পরিস্থিতি-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করছি। কেননা, আমি তো নিছক চাকরি করার জন্যেই এখানে আসিনি। চাকরির চেয়েও বড় কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি। সে দায়িত্ব তো হলো ব্রিটিশকে উৎখাত করা এবং তা সম্ভব মিলিটারীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে—তা তো ভুললে চলবে না। তাই সকল বিষয়ে জানবার চেষ্টা করতে

লাগলাম। সপ্তাহে একদিন করে ছুটি পেতাম। (যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য এই ছুটি থাকে না)। তাই সুযোগ মতো গেট্ অফিসারের অনুমতি নিয়ে শহরে বেরিয়ে যেতাম,—সেই পূর্ব-নির্দেশিত গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে।

১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়ো" ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই চরম-পত্রের বিষয়ে রেটিংরা (নৌ-বাহিনীর সৈন্যরা) যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তা ঠিক বলা চলে না। তারাও সেই আন্দোলন সম্বন্ধে চিন্তা করতো, ভাবতো। ভাবতো এই জন্যে যে, যাঁরা ঐ আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো ওদের মা-বাবা, ভাই-বোন ছিলেন। অনেক রেটিং-এর আপন ভাই-বোন মারা গেছেন, অনেক রেটিং-এর নিকট-আত্মীয়স্বজন পুলিশ ও সৈন্যের গুলীতে প্রাণ দিয়েছেন,—এই খবর তাদের কাছেও এসে গেছে। তা ছাড়া রেটিংরা তো ঐ সাধারণ ঘর থেকেই এসেছে। ওদের মধ্যেও তাই নাড়ির টান রয়েছে। ক্যাসেল্ ব্যারাকে প্রতি ঘরে ঘরে তারই আলোচনা, তারই কানাকানি। রেটিং নিত্যশিবম আর রেটিং রফিকুল মোল্লা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগলো, তাঁদের ত্ু'জনের ত্ু' ছেলেই বোম্বে শহরের বুকে সৈন্য এবং পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারিয়েছে। রেটিং ওয়ালেকর-এর দেশের বাড়ি পুলিশ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাঁর বাড়ির লোকদের অপরাধ, '৪২-এর আন্দোলনের ত্ু'জন ফেরার আসামীকে নাকি পুলিশ ঐ বাড়ির দিকে দৌড়িয়ে যেতে দেখেছিল। সেই বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও যখন পেল না তখন রাগে জ্বলে উঠে প্রতিহিংসা পূরণ করলো হতভাগ্য ওয়ালেকর-এর বাড়ির লোকজনদের বেদম প্রহার করে। তাতেও জিঘাংসা যখন পূর্ণ হলো না তখন ওর বাড়িটাকে পূর্ণভাবে আগুন

জ্বালিয়ে বহ্নুৎসব পালন করলো। রেটিং আসাদ আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "ওহে ভায়া, আর কতদিন শালারা আমাদের দেশকে জ্বালিয়ে খাবে? দিন ফুরিয়ে এসেছে। নেতাজী তো আ গিয়া আ গিয়া।" কথাগুলি সে হিন্দীতেই বলেছিল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম নেতাজী যে আসবেনই—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁর চোখে-মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। এই সময়েই আবার সাক্ষাৎ লাভ করলাম মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়েক শ' আহত নৌ-সৈন্যের, যাঁরা এসেছেন সাময়িকভাবে ক্যাসেল্ ব্যারাকে। তাঁদের ভালো চিকিৎসার জন্যে বড় মিলিটারী হাসপাতালে পাঠানো হবে। কিন্তু হাসপাতালে জায়গার অভাব থাকায় সেখানে যেতে তাঁদের দু'দিন দেরী হবে। তাই এই ব্যারাকে দু'দিন থাকতে হচ্ছে। তাঁদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি কলকাতার বাসগৃহ হতে অন্তর্হিত হয়ে গুপ্তভাবে আফগানিস্তান হয়ে বার্লিন ও রাশিয়ায় যান এবং ১৯৪৩ সালে মালয় ও ব্রহ্মদেশে আসেন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করে ফেলেছিল। এখানে এসে ব্রিটিশের অধীন ভারতীয় সৈন্য যারা জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদের নিয়ে তিনি 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' (আই এন এ.—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মী) গড়ে তোলেন। আসামে ব্রিটিশের সাথে লড়াই করেন এবং কঠোরভাবে লড়াই করে ব্রিটিশের অধিকৃত অনেক দেশ জয় করে নিয়েছেন। দেখলাম, তাঁরা আহত হওয়া সত্ত্বেও এই সংবাদ বলার সময়ে সাময়িকভাবে হলেও খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। বিশেষ করে কেবল্-সীম্যান্ মোবারক হোসেন তো খুবই গর্বিত। আস্তে আস্তে এই খবর ছড়িয়ে পড়লো এক ব্যারাক থেকে অন্য ব্যারাকে। তা থেকে ক্রমে 'তলোয়ার' জাহাজের পরিবহণ সংস্থায়। সেখান থেকে বোম্বের সমুদ্র তীরে অবস্থিত 'সিগ্‌নাল স্কুল' এইচ্. এম. আই.

এস্. (হিজ্ ম্যাজেস্টিস্ ইণ্ডিয়ান শিপ্) 'তলোয়ার' জাহাজে এবং ক্রমে ক্রমে আরব সাগরে অবস্থিত অন্যান্য জাহাজগুলোতেও এই খবর ছড়িয়ে পড়লো। সৈন্যরা এখন মনে করতে আরম্ভ করলো যে, তারাও 'আজাদ হিন্দী' (স্বাধীন ভারতীয়)।

এই প্রসঙ্গে দেশেরই স্বার্থে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়ত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যের বিষয়ে কেউ কখনও সন্দেহ না করলেও, উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘোষিত নীতির সাথে তাঁর প্রায়শঃই মতানৈক্য ঘটতো। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন, অথচ কংগ্রেস সংগঠন চাইলো 'ডোমিনিয়ন্ স্ট্যাটাস্'। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে তিনি অধিবেশন-গৃহ ত্যাগ করে 'কংগ্রেস ডিমোক্র্যাটিক পার্টি' নামক এক নতুন দল গঠন করলেন। ১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলে সুভাষচন্দ্র একে ব্যর্থতার স্বীকৃতি বলে অভিহিত করলেন। মতামতে রক্ষণশীল না হলেও ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে পুনর্বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে মতবিরোধের ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে 'ফরোয়ার্ড্ ব্লক, (Forward Bloc) নামক নতুন এক দল গঠন করতে হয় এবং কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে হয়।

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি তাঁর কলকাতার বাসগৃহ হতে তিনি অন্তর্হিত হন এবং গুপ্তভাবে আফগানিস্তান হয়ে বার্লিন ও রাশিয়ায় যান। ১৯৪৩ সালে তিনি মালয় ও সিঙ্গাপুরে আসেন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এই অঞ্চলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করে ফেলছিল। সুভাষচন্দ্র এখানে এসে আজাদ হিন্দ্

ফৌজ গড়ে তোলেন এবং আসামে ব্রিটিশের সাথে লড়াই করেন। জাপানীদের হাতে বন্দী প্রধানতঃ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হয়েছিল। প্রিয়তম নেতাজীর নেতৃত্বে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে এই সৈন্যগণ ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন। আসাম থেকে ব্রিটিশ ফৌজকে হটাবার জন্যে তাঁদের অদ্ভুত বীরত্বের পূর্ণ কাহিনী এখনও লেখা হয়নি। কিন্তু অসম যুদ্ধে তাঁদের অনিবার্য পরাজয় ঘটে এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করবার পর এই বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য ব্রিটিশের হাতে বন্দী হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর এই বীরদের এক ব্রিটিশ সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং অনেকেই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন। কংগ্রেস এদের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের দ্বারা এদের পক্ষ সমর্থন করায়।

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট সুভাষচন্দ্র এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন বলে কথিত হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে কংগ্রেসের এক ইতিহাসকার লিখেছেন: "বাল্যকাল হতেই তাঁর জীবন ছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। (তিনি ছিলেন) অতীন্দ্রিয়বাদ ও বাস্তবতার, অতীব ধর্মানুরাগ ও দৃঢ় বাস্তববোধের, গভীর আবেগবিহ্বলতা ও কঠিন পরিকল্পিত কর্মদক্ষতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ধর্মানুরাগ কত বিজ্ঞানসম্মত তার নিদর্শন মিলবে স্বনামধন্য সুকবি ও সুরসম্রাট শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের নিকটে 'মান্দালয় জেল' থেকে ৯.১০.২৫ তারিখের এক লিখিত পত্রে। ইষ্টপ্রাণতা না থাকলে যে প্রকৃত নেতা হওয়া যায় না—তা অতীব সত্য কথা। পৃথিবীর মহান অবতারগণও বলে গেছেন, "ইষ্ট নাই নেতা যেই, যমের দালাল কিন্তু সেই।" নেতাজীর অটুট ইষ্টপ্রাণতা ছিল বলেই তো তিনি 'নেতাজী' হতে পেরেছিলেন

এবং তা আবার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই। এবারে তাঁর পূর্ণ চিঠিটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

ম্যাণ্ডেলে জেল
৯.১০.২৫

"ভাই দিলীপ,

এ-কথা কিছুতেই মনে করো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। 'Greatest good of greatest number'—এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে 'good' আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের যে কোন কাজই হয় 'productive', না হয় 'unproductive'; তবে কোন্ কাজ যে 'productive', তা নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে 'unproductive' মনে করিনে। আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিস্ট না হতে পারি—আর-সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সেজন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যা-ই বলো, আমি নই। অবশ্য যদি বলো যে, আর-জন্মের কর্মফল এ-জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যা-ই হোক, এ-জন্মে যে আর্টিস্ট হলুম না তার কারণ, হতে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, 'শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না,' এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিস্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই; আর কোনও কলার সমঝদার হতে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

"দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এ আক্ষেপ করো না যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে 'The time is out of joint.' বন্ধু, সারা দেশকে

সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদনা করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন—সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্যই নেই। এ-কথা সত্যি হোক বা না হোক আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কাজে কখনও মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মতো এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

"কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে, আর সে রকম চর্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব-সাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জিত ও খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম

যে, মালদায় 'গম্ভীরা' গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ও-রূপ জিনিস কোথাও আছে বলে তো আমি জানিনে; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙলাদেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে, তা সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব **folk music** ও **folk dancing** একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যারা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

"লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্মা এক আশ্চর্য দেশ। খাঁটি দিশি নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চা করো তো মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চা কোন শ্রেণীবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুন ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞান অনেক বেশি পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ বিষয়ে আরও কথা হবে।

“দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময় সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশি প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালোবাসা জন্মেছিল—দেশনেতারূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয়। তাঁর বেশির ভাগ তক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ সহকর্মী ও অনুগামী ছাড়া তাঁর অন্য কোনো পরিজন ছিল না বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—দু’মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ’মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাই তো তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

“তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ, তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, ‘নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা’ সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন উদ্ভট কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু’চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের ‘double dose’। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি

অসাড় যদি না হয়ে যায়, তা হলে নির্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমরা যেন 'sicklied oe'r with the pale cast of thought না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত সর্ববিধ তামসিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে,—কিন্তু তার চেলারা ? গুরুর সাধন-পদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবে না ?

"আমি এ-কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা পেতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তর প্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমারসনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভেতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে ; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয় ; কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যে-ই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্ব-মানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে ; সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি

অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ

সুভাষ"

আবার জেল থেকে ভিয়েনায় যখন যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্যে তখন ৫.৩.৩৩ তারিখে তাঁর পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুত রায়ের নিকট ইংরাজীতে একখানা চিঠি দিলেন। সেখানেও তাঁর ধর্মীয় দৃঢ় চেতনার ইঙ্গিত আমরা পাই। পাঠক-পাঠিকাদের স্বার্থেই সেই চিঠির পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে দিয়ে ছিলাম।—

LLOYD TRIESTINO "Pfo., Gange"

5. 3. 33

(On his way to Vienna for rest and cure)

"My dear Dilip,

I have not written to you for a long time though you have been good enough to write to me. You see, I was passing through a species of mental torture, owing to repeated pinpricks of the Government and, till the last, I was not sure at all that I would be able to leave for Europe for treatment. Owing to the vendictive policy of the Govt. it was not possible for me to meet my parents or my friends. Only a few near relatives were allowed to interview me in Jubbulpore Jail. Many friends came from distant places to Bombay to interview me, but they had to return disappointed. The police officers who escorted me up to the boat, surrounded me like a pack of hounds till the ship actually sailed from the harbour. These pinpricks

which continued till the moment of sailing from Bombay caused me intense pain.

"However, I do not think I should worry you with these petty affairs. It was so good of you to feel so keenly for me all the time that I was suffering in custody. And it was so unexpected—because you are supposed to have 'given up the world' and taken to Yoga. To be quite frank, my dear Dilip, quite apart from Yoga and spirituality—your intensely 'human' feeling for me has profoundly moved me. That you—who are supposed to have forgotten all earthly affairs and to have taken leave of your erstwhile friends—should feel so keenly for me and my position—was altogether unexpected.

"In one of your letter, you asked me about my attitude towards 'Shiva'—or something to that effect. To be quite frank, I am torn this side and that—between my love for Shiva, Kali, Durga and Krishna. Though they are fundamentally one—one does prefer one symbolism to another. I have found that my moods vary—and according to my prevalent mood, I choose one of the three forms—Shiva, Kali (Durga) and Krishna. Among these three, again, the struggle is between Shiva and Shakti. Shiva, the ideal Yogi, holds a fascination for me. You see, of late (that is, for last four or five years) I have become a believer in 'mantra shakti' by which I mean that certain mantras have an intense 'shakti'—power. Prior to that, I had the ordinary rationalistic view, viz., that mantras are like symbols and they are aids to concentration.

But my study of the Tantra philosophy gradually convinced me that certain 'mantras' or বীজমন্ত্র had an inherent 'Shakti'—and each mental constitution was filled for a particular 'mantra.' Since then, I have tried my best to find out what my mental constitution is like and what 'mantra' I would be suited for. But so far I have failed to find that out because my moods vary and I am sometimes a Shiva, sometimes a Shakta and sometimes a Vaishnava. I think it is here that the Guru becomes useful, because the real Guru knows more about ourselves than we do and he could at once tell us what 'mantra' we should take up and which method of worship we should follow.

"To come back to matters mundane, I reach Venice to-morrow. From there I proceed to Vienna to consult the doctors. Thereafter I shall probably go to some Swiss Sanatorium.

"The voyage was fairly pleasant one up to Port Said as the sea was calm. Since passing Port Said we have encountered very rough weather. My troubless (like abdominal pain) are still persisting —but nevertheless I have been feeling somewhat better. Before we reached Port Said I had been feeling decidedly better but the rough weather has upset me since we entered the Mediteranean.

"I shall stop here today as the rolling is making writing somewhat difficult.

With warmest love
I am
Ever yours affly
Subhas."

নেতাজীর ইংরাজী চিঠির পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

লয়েড্ ট্রিয়েস্ট্রিনো "পিএফ্ও., গঙ্গে"

৫. ৩. ৩৩.

(বিশ্রাম ও রোগ নিরাময়ের জন্য ভিয়েনার পথে)

প্রিয় দিলীপ,

বহুদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। তুমি অবশ্য পত্র দিতে ভোলনি। তুমি জান, সরকারের একের পর এক উৎপাতের জন্য আমি এ যাবৎ মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটাতে ছিলাম। চিকিৎসার জন্য আমার ইউরোপ যাওয়া সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে শেষ মুহূর্তেও আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। সরকারের প্রতিহিংসা-পরায়ণ নীতির জন্য পিতামাতা কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার সম্ভব হয়নি। কয়েকজন মাত্র নিকটআত্মীয় জব্বলপুর জেলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন। দূর-দূরান্তর হতে বহু বন্ধু-বান্ধব বোম্বেতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন ; কিন্তু নিরাশ হয়ে তাঁদেরকে ফিরে যেতে হয়েছিল। জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়বার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পাহারাদার পুলিশ-কর্মচারীরা একদল শিকারী কুকুরের ন্যায় আমাকে ঘিরে রেখেছিল। বম্বে ত্যাগ করবার পূর্ব পর্যন্ত এই সব উৎপাত আমার গভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল।

যাক্, এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তোমার মন ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। বন্দীদশায় অসুস্থ থাকাকালে সর্বক্ষণ তুমি আমার জন্য ভাবিত ছিলে, এটা তোমার সহৃদয়তারই পরিচয়। এ একান্তই অপ্রত্যাশিত,—কারণ, তুমি এক্ষণে সংসার ছেড়ে যোগের পথ ধরেছ। প্রিয় দিলীপ, যোগ ও আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিয়ে খোলা মনেই বলি, আমার প্রতি তোমার এই 'মানবিক' দরদ—মমতা, আমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। যে-ব্যক্তি

সংসারের সব কিছু ভুলে, এতাবৎকালের সঙ্গী-সাথীদের ফেলে দূরে সরে গেছে, সেই লোক আমার ও আমার অবস্থার জন্য এতখানি প্রাণঢালা দরদ পোষণ করবে,. এ কোনক্রমেই যে আমি আশা করতে পারিনি, ভাই!

তোমার পত্রগুলির মধ্যে একখানিতে তুমি 'শিব' কিংবা ঐ রকম কিছু সম্পর্কে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছ। খোলাখুলি বলতে গেলে, শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ—এঁদের প্রত্যেকের প্রতিই আমার প্রেমভক্তি আছে, কিন্তু দোদুল্যমান—একবার ইনি, একবার তিনি। যদিও মূলতঃ এঁরা এক, তবু এক-একজন এক-একটি প্রতীক পছন্দ করেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার মধ্যে এই সব ভাবের পরিবর্তন ঘটে। মনের বর্তমান অবস্থানুযায়ী আমি শিব, কালী (দুর্গা) ও কৃষ্ণ, এই তিনটির যে-কোন একটিকে গ্রহণ করি। এই তিনটির মধ্যে আবার শিব ও শক্তিকে নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। আদর্শ যোগী হিসেবে শিবের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। তুমি জান, সম্প্রতি (গত ৪।৫ বছর যাবৎ) আমি 'মন্ত্রশক্তি'তে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। আমি মনে করি, কোন কোন মন্ত্রের মধ্যে অমোঘ শক্তি বর্তমান) ইতিপূর্বে মন্ত্র সম্পর্কে আমার সাধারণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। মনে করতাম যে, মন্ত্রগুলি প্রতীকের মতো। তা মনঃসংযোগের সহায়ক। কিন্তু তান্ত্রিকদর্শন অধ্যয়নের ফলে ক্রমে ক্রমে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, কোন কোন মন্ত্রের বা বীজমন্ত্রের একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। মানসিক গঠন অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে এক-একটি বিশেষ মন্ত্র উপযোগী। তখন থেকে আমি নিজের মানসিক গঠনের স্বরূপ কি এবং আমার সঠিক মন্ত্রটিই বা কি হতে পারে তা জানবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা খুঁজে পেতে আমি এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছি। কারণ, ভাবের বৈলক্ষণ্য হেতু আমি কখনও শৈব, কখনও শাক্ত এবং কখনও বা বৈষ্ণব। আমার মনে হয়, এই-

খানটাতেই গুরুর প্রয়োজন। কারণ, প্রকৃত গুরু আমাদের নিজেদের অপেক্ষাও আমাদের বিষয় অধিক জানেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলতে পারেন, কোন্ মন্ত্র আমাদের গ্রহণীয় এবং কোন্ সাধন-পদ্ধতি আমাদের উপযোগী।

এইবার পার্থিব জগতে ফিরে আসি। আমি আগামীকাল ভেনিসে পেঁাছব। সেখান থেকে ভিয়েনা যাব ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে। তারপর সম্ভবত আমি সুইজারল্যাণ্ডে কোন একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে চলে যাব।

সমুদ্র শান্ত থাকায় পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত আমার সমুদ্র-যাত্রা বেশ আরামদায়কই ছিল। পোর্ট সৈয়দ পার হওয়ার পর আমাদের খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আমার দৈহিক যন্ত্রণাদি (তলপেটের বেদনা) এখনও চলছে। তৎসত্ত্বেও আমি অনেকটা ভালবোধ করছি। পোর্ট সৈয়দে পেঁাছবার পূর্ব পর্যন্ত খুবই ভাল বোধ করছিলাম। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য অস্বস্তি বোধ করছি।

এখানেই শেষ করতে হলো। জাহাজের দোলানীতে লেখা অসম্ভব করে তুলছে।

আন্তরিক প্রীতিসহ
তোমার চিরপ্রিয়
—সুভাষ

এখন আবার আমরা সেই নৌ-বাহিনীর আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। নৌ-বাহিনীর সকলেই তখন নিজেদের 'স্বাধীন ভারতীয়' (আজাদ হিন্দী) বলে মনে করতে আরম্ভ করলো।

এই সময়ে সৈন্যবাহিনীতে (সমগ্র স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীতে) ঘটনা-প্রবাহ এমনই ছিল যে, সৈন্যরা নিজেদের দৈনন্দিন অভাব-

অভিযোগকে পর্যন্ত আর চেপে রাখতে পারছিল না। নানাভাবে তা ব্যক্ত করতে আরম্ভ করলো। একদিন ঘটনাক্রমে কোন এক রেটিং-এর তুপুরের খাওয়ার সময়ে তার প্রয়োজনীয় রান্না করা ডালের পরিমাণ কমে যাওয়ায় সে মারমুখো হয়ে ছুটে গেল যারা রান্না করছিল সেই রেটিংদের কিছু গালাগাল দিতে। সেখানে আবার উপস্থিত ছিল কয়েকজন গোরা সৈন্য। ঐ গোরা সৈন্যদের মধ্য থেকে তু'জন ঐ ক্ষিপ্ত রেটিংকে ধরে ফেলে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ফল হলো তার উল্টো। ঐ ক্ষিপ্ত রেটিংকে গোরা সৈন্যরা ধরে রাখায় অন্যান্য রেটিংরা রেগে গিয়ে একসঙ্গে আক্রমণ করলো ঐ গোরা সৈন্যদের। একেই তো ছিল নিকৃষ্ট খাবার, তার ওপরে আবার কম। এই আক্ষেপ নিয়ে ছুটে গিয়েছিল রেটিং-বন্ধু তারই সমগোত্রীয় (যারা রান্না-বান্না করছিল সেই রেটিংরা) বন্ধুদের অভিযোগ জানাতে। পথে পেল গোরা সৈন্যদের বাধা। একেবারে সোনায় সোহাগা। লড়াই বাধে আর কি ! গোরা সৈন্যরা রাইফেল একবার তুলেও ছিল, কিন্তু কোন অর্ডার না পাওয়ায় গুলী চালনা থেকে নিরস্ত থাকলো। কিছু হাতাহাতি হওয়ার পরে গোরা সৈন্যরা স্থানত্যাগ করলো। তার পরে আপনা থেকেই রেটিংদের ক্রোধ প্রশমিত হলো। যুদ্ধের দিনগুলির ঘটনাবলী তাদের মনে জাগতে শুরু করেছে। তারা প্রায়ই দেখতে পেতো, তারা যখন ব্রিটিশ নাবিকদের (সৈন্যদের) পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছিলো, তখন গোরা সৈন্যরা পেতো পক্ষপাতমূলক বৈষম্য। নৌ-ঘাঁটিতে অথবা যুদ্ধ-এলাকাতে তাদের (গোরা সৈন্যদের) ছিল ভালো ভালো খাবার, ব্যবস্থা ছিল ভালো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের। তারা চলাফেরা করতো অনেকটা ইচ্ছামতো। ইচ্ছা করলেই স্বচ্ছন্দে ভারতীয় সৈন্যদের ক্যান্টিন, মেসের কামরা, স্নানের জায়গা ব্যবহার করতে পারতো। কিন্তু অপরদিকে ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের কিছুই ব্যবহার করতে পারতো

না। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সৈন্যরা যদি ব্রিটিশ অফিসারদের অভিবাদন করতে ভুলে যেতো, তবে তার জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। অপরপক্ষে ভারতীয় অফিসারদের ওরা অভিবাদন না জানালে কিছুই হতো না। এটা দেখা গেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় সৈন্যদের মনে হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল প্রবল। এই প্রভেদগুলি ছিল খুবই অভদ্র ও অপমানজনক। ব্রিটিশের লোকেদের জন্যে, সে বহুদূরের সমুদ্র তীরেই হোক, বা গভীর জঙ্গলেই হোক ভালো ভালো গরম খাবারের ব্যবস্থা, ভালো যানবাহন এবং অস্থায়ী বসবাসের জন্য ভালো ভালো তাঁবু দেওয়া হতো। অথচ ভারতীয় সৈন্যরা কিছুই পেতো না। তাদের কপালে জুটতো না কিছুই। অতি-কষ্টে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে কাদায়-বৃষ্টিতে ঝলসানো রোদে না খেয়ে কোনরকমে প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টা। ওদিকে কার্যক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে দেখা গেছে ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের তুলনায় অনেক, অনেক বেশি পারদর্শী। তবুও কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের ওরা (ব্রিটিশ সৈন্যরা) বলতো, 'অযোগ্য কালা আদ্‌মী' (ইন্‌কম্পিটেন্ট্ নিগারস্)। যুদ্ধচলা কালে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈন্যরা এমনভাবে ব্যক্তিগত অবমাননা এবং পার্থক্য বোধ করেছিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি ভারতীয় সৈন্যদের আর এতটুকুও সমবেদনা বা সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিল না। সবই যেন উবে গেছে। ফলে, তারা গোরা সৈন্যদের বিদ্রূপ করে 'টমী' বলে ডাকতে শুরু করলো এবং তাদের (গোরা সৈন্যদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে উস্‌খুস্ করতে লাগলো। তা ছাড়া দৈনন্দিন খাদ্যও ছিল ওদের বেলায় উৎকৃষ্ট আর ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটতো নিকৃষ্ট। এ যে শুধু নৌ-বাহিনীতেই বিদ্যমান তা নয়, সমগ্র ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেই (স্থল, বিমান ও নৌ-বাহিনীতেই) ঐ একই অবস্থা বা বৈষম্য বিদ্যমান। ফলে গোটা ভারতীয় সেনাবাহিনীই আজ একটা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তেই

অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকলেই নিজেদের এখন 'আজাদ হিন্দী' বলে ভাবতে শুরু করেছে। তাই, এই সুযোগে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা চুপ করে না থেকে এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করলো এবং প্রস্তুতি চালাতে থাকলো এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের। গোপন সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের কাছ থেকেও আমরা কিছু কিছু নির্দেশ পেলাম। (অবশ্য, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায় যে-সকল কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা স্থান পাননি তাঁদের কাছ থেকেই ঐ নির্দেশ পেয়েছিলাম।) তাঁদের মধ্যে তখনও কেউ কেউ আত্মগোপন করেই থাকতেন; কিন্তু আমাদের সাথে তাঁদের যোগসূত্র ছিল।

সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ভারতীয় সমগ্র সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীতে) সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক স্তরে ১৯৪৩ সালের ১লা মে এক গোপন ও বিপদসঙ্কুল কর্মসূচী গ্রহণ করলেন এবং তা বিভিন্ন শাখায় স্থানীয় ভিত্তিতে রূপায়ণ করতে নির্দেশ পাঠানো হলো। সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর কাঠামো ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) যে যে বিষয় নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তা মুখে মুখে প্রচারের দ্বারা ঐ সকল অসন্তোষকে কেন্দ্রীভূত করে একই খাতে বইয়ে দেবার জন্যে একপ্রকার চুপ-চুপ, ফিস্-ফিস্ অভিযান লাগাতার চালাতে হবে (Whispering Campaign)।

(খ) জাহাজে, ব্যারাকে এবং অন্যান্য সেনাবাহিনীর সংগঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ এজেন্ট প্রোভোকেটরস্।

(গ) অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের দ্বারা (পোস্টারিং সমেত) ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা।

(ঘ) সমস্ত সেনাবাহিনীকে (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে) ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা,—ইত্যাদি।

আমি নৌ-বাহিনীর কর্মী। গোপন সংস্থার নির্দেশমতো আমরা কাজ শুরু করলাম ক্যাসেল্ ব্যারাকে এবং এম. আর. ব্যারাক্সে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আমরা দেশ-প্রেমিকদের বীরত্বের গাথাসমূহ আলোচনার মধ্যে হাতিয়ার করে নিলাম। 'হুইস্পারিং' কর্মসূচীর মধ্যেও তাকে স্থান দিলাম। নৌ-বাহিনীতে ব্রিটিশের নিরাপত্তা সংস্থা ছিল খুবই জোরালো। তাদের এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে একটু একটু করে আমরা এগোতে লাগলাম। আলোচিত হতে লাগলো ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা, বাঁশের কেল্লা তিতুমীরের কথা, সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মঙ্গল পাঁড়ের কাহিনী। তাছাড়া বিপ্লবী বীর ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, এমন কি দক্ষিণের কাট্টাবোম্মান এবং আসামের মণিরাম-এর কথাও বাদ পড়লো না। নেতাজীর আই. এন. এ. বাহিনীও যে কামান-বন্দুক-মেশিনগান নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাও প্রচারের হাতিয়ার করা হলো। ভারতের কিষাণ-মজুর-মধ্যবিত্তের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর কথাও আলোচনার মধ্যে আনা হলো। এইভাবে প্রস্তুতি চলতে থাকলো ১৯৪৩ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। আর মনে মনে ভাবতে থাকলাম,—এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে ব্রিটিশ-সামরিক ঔদ্ধত্যের মেরুদণ্ড ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে। শুরু নয়, শেষও নয়, আজকের এই প্রস্তুতি, পরাধীনতার বন্ধন মোচনে মুক্তির যে সংগ্রাম, তা সেই শেষ পরিণামের শুরু। অবিশ্বাস্য ঘটনা, কিন্তু অতি সত্য। অসম্ভব কি? তাদেরও (সৈন্যদের) রক্ত-স্রোতে বইছে সংগ্রামের তীব্র অগ্নিধারা! দেশপ্রেমের অমিত শক্তির অধিকারী করেছে তাদের। সৈন্যরা ভাবতে শুরু করেছে, এবং তা রাজনীতির ধারাতেই,—জাতীয়তাবাদী ভারত ব্রিটিশকে

বলেছিল, ভারতের ব্যাপার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে। কী অধিকার আছে তাদের আমাদের দেশের ওপর রাজত্ব করার? কিন্তু সে ব্যাপারে ব্রিটিশরা ছিল তেমনি অনমনীয়। কারণ ব্রিটিশ জানতো, জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকেরা ছিল একমাত্র ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে পরিচিত। সেই সৈন্যদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতার কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে,—এই ধারণা ব্রিটিশের মনে কখনও আসেনি। তাই তারা ভেবেছিল এই ভাড়াটে সৈন্য দিয়েই স্বাধীনতার আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করে দিতে সক্ষম হবে। বিশেষতঃ '৪২-এর আন্দোলনকে দমন করে তাদের সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো। কিন্তু তারা হিসেবে একটু ভুল করেছিল। ১৯৪২ সাল আর ১৯৪৩ বা ৪৪ সাল যে এক নয় এবং তা যে এক হতে পারে না,—এই ধারণার অভাব থাকাই হলো মস্তবড় ট্রাজেডি। ব্রিটিশ সেই ট্রাজেডি বহন করে চলছে। তার প্রমাণ হলো, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকেদের মনে বোধ জাগলো যে, তারা যে ব্রিটিশের একমাত্র ভাড়াটে সৈন্য নয়, তারাও যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী হতে পারে, সেটাই প্রমাণ করার ভার পড়লো আজ তাদের ওপর। তারা যেন জ্ঞাতসারেই হয়ে পড়লো এক-একজন ষড়যন্ত্রকারী। মনে হলো, এ যেন এক ঐশ্বরিক শক্তি তাদের আশ্রয় করে বলীয়ান করে তুলেছে।

ওদিকে দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। পরিধেয় পোশাকেরও টানাটানি শুরু হলো। সৈন্যদের মাসিক ভাতাও ঠিকমত তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রের কাছে সৈন্য বিভাগের হেড-কোয়ার্টার থেকে পাঠানো হচ্ছিল না। প্রায়ই তাদের বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবার তাগিদ আসতে থাকে চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে আছে। সর্বত্র গুঞ্জরণ চলছে। অসন্তোষ যেন চরমে উঠলো।

আগস্ট মাস এসে গেল। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ৮ই আগস্টকে স্মরণে রেখে এবং ৯ই আগস্ট বিপ্লবের দিন স্বীকৃতি দিয়ে (যা ১৯৪২ সালে ঘটেছিল) তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সৈন্য-বাহিনীতে ঐ ১৯৪৩ সালের ৯ই আগস্ট তিন বিভাগেই (স্থল, নৌ ও বিমান) একটি করে বিপ্লবের 'স্টেশন' হিসাবে 'এ্যাকশন' কমিটি তৈরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যাতে করে একই সঙ্গে লড়াইয়ে নামা যায়। প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, স্থল-বাহিনীতে শ্রীযুত চন্দ্রসিং গাড়োয়ালের নেতৃত্বে, নৌ-বাহিনীতে শ্রীযুত মদনলাল সাক্সেনা এবং বিমান-বাহিনীতে শ্রীযুত পি. কোট্টায়াম-এর নেতৃত্বে পৃথক পৃথক-ভাবে তিনটি 'এ্যাকশন' কমিটি গঠিত হবে। আরও প্রস্তাব নিলেন, প্রত্যেক 'এ্যাকশন' কমিটিতে অন্ততঃপক্ষে তেরজন করে সভ্য থাকবেন। এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তই সকলকে একমত হয়েই গ্রহণ করতে হবে। আরও ঠিক হলো, একই সময়ে একই তারিখে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করা হবে। এও ঠিক করা হলো, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা আমাদের সঙ্গে এক হয়ে সেনাবাহিনীর বাইরে জন-গণের মধ্যে বিশেষ করে মজুর-কিষাণ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের আন্দোলনের সমর্থে এক উত্তাল-উদ্দাম সংগ্রামের ঢেউ বইয়ে দেবেন। ১৯৪২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সেই বিপ্লবের দিন ধার্য হলো প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

প্রকাশ্য আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে ঠিক হলো, সৈন্যরা তাদের খাবার গ্রহণ করবে না। কারণ, ব্যারাক-জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি রেটিং বা সৈন্য জড়িত থাকে। যে খাবার তাদের দেওয়া হতো, সে শুধু খারাপই ছিল না, ছিল অখাদ্য ও অরুচিকর। খাবার নিকৃষ্ট, অপরিতৃপ্ত। সুতরাং খাবার গ্রহণে অস্বীকার করতে হবে। তাহলে সামগ্রিক-ভাবেই সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যদের মনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক অনমনীয় ও তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামের স্পৃহা জাগবে। কারণ সৈন্যদের

মনে জাগবে—খারাপ খাদ্য সরবরাহ্ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের (সৈন্যদের) বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে এক কঠোর শাস্তি বিধান করে রেখেছে, 'ভারতীয় কালা আদমী' বলে। অতএব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একান্ত প্রয়োজন। খাবার যেহেতু গ্রহণ করা হবে না, সেইহেতু কোন কাজও করা হবে না। শ্লোগান ঠিক করা হলো,—"নো ফুড, নো ওয়ার্ক" (No Food, No Work) অর্থাৎ "না খাবার, না কাজ।" পরিবর্তিত ধাপে যখন আন্দোলন খুবই ঘোরালো হয়ে উঠবে তখন শ্লোগান হবে, "ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো", "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক", "কংগ্রেস-লীগ এক হোক," "এখনই বিদ্রোহ কর", "আমরা সবাই আজাদ হিন্দী, "গোরাদের হত্যা কর", "স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ", "দিল্লী চলো, এগিয়ে চলো" ইত্যাদি। পুরাপুরি রাজনৈতিক শ্লোগান। এখানে কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন, '৪২-এর "Quit India" (ভারত ছাড়ো) কথাটি প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নিজের নয়। এ তাঁর উক্তির পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। বোম্বাই এর 'ইন্দু-প্রকাশ' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ বেনামীতে পর-পর সাতটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধেই শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ রাজশক্তিকে ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য এ দেশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কংগ্রেস সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময়ে অরবিন্দের মুখে এ উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দেখতে দেখতে অক্টোবর মাস এলো। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে লর্ড লিন্‌লিথগোর স্থলে লর্ড ওয়াভেল্ (Lord Wavell) বড়লাট নিযুক্ত হলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি ক্রিপ্‌স্ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকলেন। দেশের জাতীয় নেতারাও তাঁর প্রতি একটু সহানুভূতিসুলভ মনোভাব দেখাতে লাগলেন। আমরা কিন্তু জানি, ওঁরা সকলেই একই ধাতুতে গড়া। রকমফেরে কেউ কেউ নরম-গরম কথা বলতে পারে,—এই মাত্র তফাৎ।

এদিকে আমাদের ট্রেনিংও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুনতে পেলাম, পাঁচখানা জাহাজ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে আফ্রিকার বর্ডারে পাঠাবে মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় ফ্রন্ট্‌কে সাহায্য করতে। আমরা যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাদের ঐ জাহাজগুলিতে পাঠানো হবে। আমরাও ঠিক করলাম, ১৮ই ফ্রেব্রুয়ারির পুর্বে আমাদের পাঠাবার ব্যবস্থা হলে, যে-দিন পাঠানো হবে সেই দিনই ঐ প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করব এবং তা ঐ গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে অন্য দুই বাহিনীকেও জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। ওদিকে আবার প্রচার হয়ে পড়লো যে, 'খাইবার' জাহাজ, সামরিক ভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে ক্রুজার, ১৯৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি কেটে কেটে এক বিরাট বহরের আগে আগে যাচ্ছিল। পেছনে ব্রিটিশ জাহাজ 'নরফোক্', 'গ্লোরি' আর 'গ্লস্টার' অনুসরণ করে যাচ্ছে। বহর যাচ্ছে ইতালির উপকূলে জেনোয়া বন্দরের দিকে। 'খাইবার'কে সামনে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র বড়ই দুর্ধর্ষ। 'কালা আদমী' ভারতীয়দের উপর দিয়েই যাক না সেই দুর্ধর্ষ কামান-বন্দুকের অগ্নিবর্ষণ গোলা। 'কালা আদমী' আর 'সাদা-আদমী'র রক্ত তো এক নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে বরাবরই ব্রিটিশ অগ্রবর্তী-বাহিনীতে ভারতীয়দের ব্যবহার করতো। যুদ্ধের প্রথম চোট যাবে ভারতীদের উপর দিয়ে—এই ব্যবস্থা ব্রিটিশরা চিরস্থায়ী করে রেখেছিল। আরও একটা মজার ব্যাপার ছিল—যত জীর্ণ যত পুরানো জাহাজ বা কামান-বন্দুক ছিল তা দিয়েই ভারতীয় রেজিমেন্ট বা বহর তৈরী করা হতো। ফলে ভারতীয়দের প্রাণ যেতো বেশি বেশি করে। ভারতীয়দের প্রাণ আর ব্রিটিশের প্রাণ তো এক নয়! তাই এই ব্যতিক্রম।

এইচ. এম. আই. এস. 'খাইবার' অর্থাৎ হিজ ম্যাজেস্টিস্ ইণ্ডিয়ান্ শিপ্ 'খাইবার' ব্রিটিশের রাজা ষষ্ঠ জর্জের পৈতৃক সম্পত্তি।

আর জাহাজের প্রাণটুকু শুধু তার নাবিকেরা। অতি পুরাতন, অতি জীর্ণ এই জাহাজ। বেছে বেছে ভারতীয় নাবিকদের দেওয়া হতো এই রকম মান্ধাতা আমলের ফেলে-দেওয়া বৃদ্ধ জাহাজ। জাহাজের জঠরে বয়লার ঘরে আগুন জ্বলছে। ধুক্‌পুক্‌ করছে জরাজীর্ণ 'খাইবার'-এর প্রাণ। সমাগত যুদ্ধের আশঙ্কায় কম্পিত 'খাইবার' জাহাজ। হঠাৎ ইতালিয়ান্‌ ডেস্ট্রয়ার 'খাইবার'-এর ওপর আঘাত করলো। আগুন ধরে গেল। 'খাইবার' জাহাজ যুদ্ধে লড়ে নিখোঁজ হলো। অনেকে মনে করলো এ্যাটলান্টিক মহাসাগরে জার্মান ডুবো-জাহাজের আক্রমণে সলিল-সমাধিই ঘটেছে। বোম্বাই-এর ওয়াটার ফ্রণ্টের এলাকায় বাস করে বহু জাহাজীর পরিবারবর্গ। 'খাইবার'-এর নাবিকদের যারা নিকট-আত্মীয় তারা ভেবে পায় না কোথায় গেল তাদের ছেলেরা! কান্নার ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো বস্তীর প্রতি ঘরের ওপর দিয়ে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আনাচে-কানাচে।

এক-পা এক-পা করে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর এসে গেল। জোর লড়াই চলছে সমস্ত ফ্রণ্টেই। পৃথিবীর পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। কে জেতে কে হারে—এই নিয়ে সর্বত্র আলোচনা। কোন কোন ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ এগিয়ে যাচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নাৎসীপক্ষ অগ্রগামী। সমস্ত পৃথিবীময় একটা টারময়েল্‌ চললো। এই সঙ্কটের মধ্যেই যে সুযোগ আছে তাও আমরা জানতাম। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যেমন সুযোগ নিতেন, বিশেষ করে বিপ্লবী ঠাকুর সাহেব যা করতেন, তা আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে।

এখানে ঠাকুর সাহেবের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তাঁর বিষয়ে একটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন মনে করি। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর (ঠাকুর সাহেবের) সঙ্গে একমত ছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর সাহেবের কাছেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সে যুগের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—"At that

time the military organisation of the great empires and their means of military action were not so overwhelming and apparently irresistible as they now are ; the rifle was still the decisive weapon, air power had not been developed and the force of artillary was not so devastating as it afterwards became. India was disarmed, but Sri Aurobindo thought that with proper organisation and help from outside this difficulty might be overcome and in so vast a country as India and with the smallness of the regular British armies, even a guerrilla warfare accompanied by general resistance and revolt might be effective. There was also the possibility of a general revolt in Indian army."—
(Aurobindo on himself and Mother : P. 39)

বরোদায় গুপ্তসমিতির নেতা ছিলেন ঠাকুর সাহেব। অবশ্য এই গুপ্তসমিতি হলো ভারতের অগ্নিযুগের গোড়ার দিকের কথা। অনেকের ধারণা ঠাকুর সাহেব ছিলেন রাজপুতনা বা মধ্যপ্রদেশের কোন করদ রাজ্যের নরপতি। স্থির হয়েছিল, ভাবী নিখিল ভারত প্রজাতন্ত্রে ইনি হবেন দেশপতি অথবা প্রেসিডেণ্ট। মনে হয় তাঁরই আদর্শ নিয়ে মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রামে 'Republican Army' তৈরি করেছিলেন এবং তাঁদের দ্বারাই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়েছিলেন। ঠাকুর সাহেবকেই কেন্দ্র করে কাজ চলছিল পশ্চিম-ভারতের সর্বত্র। কর্মীদের নিকট তিনি ছিলেন এক অদৃশ্য রহস্যময় পুরুষ। তাঁর সংগঠনে সমস্ত পশ্চিম-ভারত বিভিন্ন সার্কেলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সার্কেলের জন্য এক-একজন দেশপতি তিনি নির্ধারিত করতেন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন গুজরাট সার্কেলের সভাপতি। বাঙলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পর পি. মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র) বাংলার প্রদেশপতি নির্ধারিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ঠাকুর সাহেব প্রচ্ছন্ন হয়ে ছদ্মবেশে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের বহুস্থানের সৈন্যবাহিনীতে তাঁর লোকজন ছিল। সংগঠনের বিপ্লবীদের সকলেরই ধারণা ছিল সমগ্র ভারতে ঠাকুর সাহেবের সংগঠনের শাখা রয়েছে আর পর্বতে অরণ্যে হাজার হাজার নাগা সাধু-সন্ন্যাসীর দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাঁদের পেছনে রয়েছেন ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ। ইঙ্গিত পেলেই একদিন তারা মহাসমরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভারতে মহাবিপ্লব সফল হতে তখন কতক্ষণ!

এই ঠাকুর সাহেব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—"The Rajput leader was not a prince but a noble of the Udaipur State with the title of Thakur. The Thakur was not a member of the (revolutionary) Council in Bombay; he stood above it as the leader of the whole movement while the Council helped him to organise Maharastra and Marhatta states. He himself worked principally upon the Indian Army of which he had already won over two or three regiments. Sri Aurobindo took a special journey into Central India to meet and speak with Indian Sub-Officers and men of one of this regiment."—
(Aurobindo on himself and Mother : P. 29)

তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) বিপ্লবীরা ভারতের বাইরের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলির সাহায্য এবং ভিতরের বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে সৈন্যবিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে মুক্ত, স্বাধীন করবার বাসনা নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত এখনও পরাধীন। '৪২ সালের আন্দোলনে যে ধাক্কা ব্রিটিশকে দেওয়া হয়েছিল তার অন্ততঃ চারগুণ বেশি ধাক্কা এবারে দিতে হবে—কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার এই ছিল প্রত্যাশা। ঠাকুর

সাহেবের আদর্শও তাই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন—ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে সংগঠন গড়ে তুলে সেখানে বিদ্রোহ ঘটানো। পূর্বেও আলোচনা করেছি, আমরা সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতেই এখানে এসেছি। সে সুযোগও উপস্থিত। বিশেষভাবেই বলতে পারা যায়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখন আমাদের অনুকূলে। এর সদ্ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা সেই কাজেই এগোতে লাগলাম।

কাল সত্যিই আলেয়া। সে '৪৩ সালকে বিদায় দিয়ে ১৯৪৪ সালে পা বাড়ালো। কত সুখকর স্বপ্ন দেখাতে লাগলো। ভারত-জননী বোধহয় পাথরের আল্‌মোড়া ছেড়ে চিন্ময়ী মূর্তিতে সচল হয়ে উঠলেন। আর, আমাদের যেন ডেকে বললেন, ওঠো—জাগো, জড়তা ঝেড়ে ফেলে আমার দিকে ফিরে তাকাও। আমি তো দক্ষিণ আয়ন ছেড়ে উত্তর আয়নে ফিরে আসছি। নতুন বছরের নতুন মাসে এসে পা রেখেছি। জানুয়ারি তো দুয়ার খুলেছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে এসে পা দিলাম। তার আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ১৯৪৩ সালকে বিদায় দিলাম।

বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। 'হুইস্‌পারিং' চলছে। গোপনে অতি সন্তর্পণে একটা-দু'টো করে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক শ্লোগান্ বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয়ালে এঁটে দেওয়া হতে লাগলো। সর্বপ্রথম যে শ্লোগান্ দেওয়া হলো, তা হলো,—"ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো!" নৌ-বাহিনীতে এ ঘটনা যে বিস্ময়কর! পূর্বে কখনও কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে, সেনাবাহিনীতে এইভাবে রাজনৈতিক পোস্টার ব্যারাকের দেয়ালে কেউ মারতে পারে।

নিরাপত্তাবাহিনী সতর্ক হলো বেশি করে। গোপনে গোপনে খোঁজ নিতে লাগলো, কারা এসব করছে। ভেতরের লোকে করছে, না বাইরের লোকে গেটের পাহারাদারদের হাত করে ভেতরে এসে ঐ পোস্টার লাগাচ্ছে। খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। এরই মধ্যে জানুয়ারি মাসের ২৭ দিন পার হয়ে গেল। ২৮শে জানুয়ারি, হঠাৎ এক বিস্ফোরণের মতো বিক্ষোভের সৃষ্টি হলো। এম. আর. ব্যারাক্‌স-এর ব্রিজলাল ডোঙে তার উর্দি পোশাক বেশি দিনের পুরানো হওয়ায় এবং পোশাকের অনেক জায়গা ছিঁড়ে যাওয়ায় গিয়েছিল স্টোর-রুমে উর্দিটাকে পাল্‌টে নিতে। তখন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, পোশাক পাল্‌টে নিতে হলে তার পুরানোটা জমা দিতে হবে। ব্রিজলাল নিয়ম মতই তা করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার অপরাধ হলো, সে কেন শুধু তার আণ্ডারওয়ার পরে গিয়েছিল উর্দিটাকে বগলদাবা করে স্টোর-রুমের অফিসারের সামনে? সেই অফিসার ছিলেন মিঃ ডেন্‌হাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজলালকে 'হলট্‌' করিয়ে 'ফল্‌-ইন্‌' করিয়ে তাঁর সাহায্যকারী রেটিংকে আদেশ করলেন ব্রিজলালকে 'ব্যাটন্‌ চার্জ্‌' করতে। সেই রেটিং ছিল ভারতীয়। নাম তার গফুর মোল্লা। ব্রিজলালের অন্য কোন পোশাক ছিল না ঐ পুরানো দু'টো উর্দি ছাড়া। দু'টোই যখন পাল্‌টাতে হবে তখন একমাত্র থাকে তার পুরানো দু'টো আণ্ডারওয়ার। তাই সে ঐ দু'টো আণ্ডারওয়ারের একটা পরে গিয়েছিল নিরুপায় হয়ে। 'ফল্‌-ইন্‌' করানোর পরে ব্রিজলাল অনুনয় করে তার বক্তব্য বলতে চেয়েছিল; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কে কার কথা শোনে! অফিসার ডেন্‌হাম তা না শুনেই ব্যাটন্‌ চার্জের আদেশ করলেন, আর বললেন, "You are sons of bloody jungles." (তোমরা অসভ্য জংলীর বাচ্চা।) তাঁর সাহায্যকারী রেটিং গফুর মোল্লা আদেশ অমান্য করে দাঁড়িয়ে থাকলো। ব্যাটন্‌ চার্জ্‌ করতে এগিয়ে এলো না। মিঃ ডেন্‌হাম

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপরে রক্ষিত ব্যাটন্‌খানা শন্‌ করে টান মেরে হাতে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে গফুরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শপাং শপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেই ব্রিজলাল তার 'ফল-ইন্‌' পজিশন্‌ নস্যাৎ করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গোরা ক্ষুদে অফিসারের ওপর এবং কয়েক ঘা কিল-চড় কষে বসিয়ে দিল অফিসারের পিঠে। বেশ এক প্রস্থ মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। গফুর আর ব্রিজলাল একদিকে, অন্য দিকে একা শ্বেতাঙ্গ বীরপুঙ্গব। এই অবস্থা চলতে থাকার সময় পাশের রুমে ছিলেন শ্বেতকায় আর একজন অফিসার এবং জন-বারো ভারতীয় রেটিং। তাঁরা ছুটে এলেন বিকট সোরগোল শুনে। তাঁরা এসে ও'দের ছাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় ফোন করলেন কমাণ্ডিং অফিসে। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন্‌ ইনিগোজোন্‌স্‌ একদল গোরা সৈন্য নিয়ে হাজির হলেন স্টোর-রুমে। গোরা সৈন্যরা সমস্ত জায়গাটা ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করলো দোষী-নির্দোষ বিচার না করে সমস্ত ভারতীয় রেটিংদের—যারা ওখানে উপস্থিত ছিল। এম. আর. ব্যারাক্‌স-এর ভারতীয় রেটিংরা এই ঘটনা শুনে বিক্ষুব্ধ হলো। গুঞ্জরণ শুরু হলো। খবর পেয়ে এ্যাকশন কমিটির কয়েকজন সদস্য ছুটে এলেন এবং রেটিংদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে আপাততঃ নিরস্ত করলেন। তাঁরা ভবিষ্যতের বৃহত্তর আন্দোলনের মাপকাঠিতে বিচার করে তখনকার মতো বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভকে হুইস্‌পারিং করে রেটিংদের মধ্যে ব্যাপক সংগ্রামের এক পদক্ষেপ বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন এবং আপাততঃ ক্রোধকে প্রশমিত করে কোর্টমার্শালের রায়ের অপেক্ষায় থাকতে অনুরোধ করলেন। এ্যাকশন কমিটির দৃষ্টিতে ঝড়ের পূর্বাভাস ধরা পড়লো।

দেখতে দেখতে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস এসে গেল। ৮ই ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড ওয়াভেল্‌ ভারতের ঐক্যকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন, "ভূগোলকে সংশোধন করা যায় না। প্রতিরক্ষা

এবং আভ্যন্তরীণ ও বাইরের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ভারত একটি স্বাভাবিক ঐক্যবদ্ধ খণ্ড (Unit)।" এর এক বছর পরে তিনি ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁর ঘোষণায় দেশের বিশেষ করে জাতীয় নেতাদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একপ্রকার রাজনৈতিক মোহ বিস্তার করলো। অনেকেই তখন তাঁকে (লর্ড ওয়াভেলকে) 'নিজ পরিবারভুক্ত একজন' বলে মনে করতে থাকলো। আমার মনে হয়, যাঁরা আপোষপন্থী তাঁদের মধ্যেই এই মোহ বিস্তার করেছিল।

আমরা কিন্তু উদ্বিগ্নে দিন কাটাচ্ছি। কখন কি হয়, কখন কি হয়—এই ভেবে। এরই মধ্যে ১০ই ফেব্রুয়ারি এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো। 'হুইস্‌পারিং ক্যাম্পেন্' ঠিকমতোই চলছে। লক্ষ্য করা গেল, হায়ার অফিসারেরা পূর্বে যে-রকম আমাদের সাথে হেসে-খেলে কথা বলতেন, সে-রকম যেন তাঁরা আর কথা বলছেন না। উপর মহলে যেন একটা থমথমে ভাব। সব যেন গম্ভীর। বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ঘটেছে। সন্দিগ্ধ মন, প্রশ্ন জাগে,—তবে কি আমাদের গোপন সিদ্ধান্ত ওদের কাছে ধরা পড়েছে? সব কিছুই কি জেনে গেছে? নতুবা একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা আমাদের এড়িয়ে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে কেন? হবেও বা তাই! মিলিটারীর মধ্যে যেভাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ গুপ্তচরবাহিনী তৎপর রয়েছে তাতে ওদের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাদের হাতে কি আমাদের কোন গোপন তথ্য, লিখিত দলিল এসে গেছে? এই ধরনের নানা প্রশ্ন মনে জাগতে থাকে। হঠাৎ মিঃ এস. সি. ধর (শ্রীযুত সুবলচন্দ্র ধর) যিনি নৌ-বাহিনীর গুপ্তসমিতির একজন সক্রিয় সদস্য, হন্ হন্ করে এসে বললেন, "মিঃ ভট্টাচারিয়া, (সৈন্যবাহিনীতে আমি পি. বি. ভট্টাচারিয়া নামে পরিচিত ছিলাম) দারুণ বিপদ, সব কিছুই

বোধহয় ধরা পড়ে গেছে। ডব্লিউ. আর. আই. এন.-এর (উইমেন্স রয়েল্ ইণ্ডিয়ান্ নেভী) মহিলা শাখার শ্রীমতী উর্মিলা বাঈ এবং শ্রীমতী অনুভা সেন আজ ধরা পড়ে গেছেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের গোপন কাগজপত্র তো ওঁদের কাছেই থাকতো। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মহিলা সদস্যা শ্রীমতী কমলা ডোণ্ডে এঁদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। ওদিকে তিনি আবার প্যারেল বস্তীর মহিলা সমিতির নেত্রী।"

কী সর্বনাশ! মহাবিপদ! কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে ভাবতে থাকলাম। কিছু পূর্বেও যে-সন্দেহ মনে জেগেছিল তা এখন সত্যে পরিণত হলো। বিদ্রোহের প্রস্তুতি-পর্বেই দুর্ঘটনা! মাথায় যেন বাজ পড়লো। কেবল চিন্তা করছি,—এ কী করে সম্ভব হলো! অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই আবার সম্বিত ফিরে এলো। ভাবলাম, মহৎ কাজের বিপদ থাকে অনেক। আমরা বিপ্লবী, বিপদ তো আমাদের থাকবেই। বাধা না থাকলে তো বিপ্লবই হতো না। বিপ্লবের দায়িত্ব যখন নেওয়া হয়েছে তখন শত শত বাধা ঠেলেই এগোতে হবে। লড়াই করতেই হবে,—তাতে যা হয় হবে। মহাবিপদের মধ্যেই আবার মহান বীর বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তাঁর ফাঁসি হওয়ার পূর্বে দেশের বিপ্লবীদের উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বিপ্লবের পথরেখা টেনে বলেছিলেন,—'If the icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your furthen pursuit to your followers as I do today. Onwards, my Comrades, onwards—never fall back." আমিও এগোবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। ঠিক এই সময়ই, সন্ধ্যার একটু পরেই কমাণ্ডার-ইন্-চীফ মিঃ অচিন্‌লেক্-এর সতর্কবাণী শোনা গেল রেডিওর মাধ্যমে। তিনি বলছেন, "মিঃ বোসের (শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস) কার্যকলাপের

অনুপ্রবেশ সেনাবাহিনীতে বরদাস্ত করা হবে না।" বোঝা গেল, মিলিটারী কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয়া মহিলাদ্বয়ের হেফাজত থেকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল উদ্ধার করতে পেরেছে।

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। সঙ্গে তার সাঙ্গপাঙ্গও এসে যায়। সন্ধ্যাবেলায়ই খবর পাওয়া গেল, আমাদের আফ্রিকার বর্ডারে পাঠানো হবে পাঁচখানা যুদ্ধ-জাহাজ দিয়ে। আরও শোনা গেল, কর্তৃপক্ষ যাদের যাদের ওপরে নজর রাখছে এবং গভীরভাবে সন্দেহ করে, তাদের সকলকে ঐ জাহাজগুলিতে ঢুকিয়ে মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে জলে ডুবিয়ে মারবে। পরে ঘোষণা করা হবে যুদ্ধে মারা গেছে। ১১ই ফেব্রুয়ারি বেলা দু'টোয় ঐ জাহাজগুলো যাত্রা করবে। রাত্রি সাড়ে সাতটায় সঙ্গে সঙ্গে নৌ-বাহিনীর এ্যাকশন কমিটির সদস্যদের (সদস্য সংখ্যা ছিল তেরো জন) খবরাখবর দিয়ে রাত্রিতে 'তলোয়ার' জাহাজে (বোম্বের তীরে অবস্থিত সিগনাল্ স্কুল) জড়ো হলাম। সেক্রেটারী মদনলাল সাক্‌সেনা সকলের সম্মতি নিয়ে সভার কাজ সুরু করলেন। এ্যাকশন কমিটির সমস্ত সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত এস. সি. ধর সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। আলোচ্য বিষয়সূচী ছিল,—(১) নৌ-বাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ পেশ, (২) পরিস্থিতির ভিত্তিতে কার্যক্রম (কর্মপন্থা) গ্রহণ, (৩) বিবিধ।

সেক্রেটারী মদনলাল সাক্‌সেনা নৌ-বাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ পেশ করতে গিয়ে বললেন, "আমাদের এই রাজনৈতিক সংগঠন (এ্যাকশন কমিটি) বাস্তবে রূপ পেল গত ৯ই আগস্ট ১৯৪৩ সালে। তার পরে আমরা আরও দু'বার মিলিত হয়েছিলাম। আজ আমরা মিলিত হলাম তৃতীয় বারে। আজ আমাদের মিলনের হেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব, তাঁরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্মিলিতভাবে কোন প্রকার সংশয় না রেখে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন।

"পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি আজ অস্থির। ভারতবর্ষ যেহেতু পৃথিবীর একটি অংশ, সেই হেতু ঐ অস্থিরতা ভারতবর্ষের প্রতিটি স্তরে আজ প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় সমগ্র সেনাবাহিনীতে ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সেই অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কি-হয়, কি-হয় ভাব আজ সর্বত্র। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর সাম্রাজ্যকে মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্যে বাইরে শক্তিদম্ভের প্রকাশ করছে আর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভেদনীতির আশ্রয় নিচ্ছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায়, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে এযাবৎ যা কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর ভেদনীতি আমরা দেখতে পাই। ভেদনীতির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত নীতিই আমরা দেখে আসছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের চাপ এবং বিক্ষোভ-এর তরঙ্গগুলি ক্রমেই তুঙ্গতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। দেশে ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ সময়ে আমাদের মনে রাখা একান্ত দরকার।

"ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও ভেদনীতি চালাবার চেষ্টা হয়েছিল প্রবলভাবে, কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। ব্রিটিশ তাঁর নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছে, গোরা সৈন্য আর ভারতীয় সৈন্যদের (কালা আদমী) মধ্যে পক্ষপাতমূলক বৈষম্য রেখে। আজ আর কোন ভারতীয় সৈন্যই (স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীর সমগ্র সৈন্য) ব্রিটিশদের বা ব্রিটিশ সৈন্যদের নিজেদের বন্ধু বলে মনে করে না। নৌ-বাহিনীতে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। অন্য দুই বাহিনীতেও এই একই দৃশ্য। ব্রিটিশ সৈন্যদের তো 'টোমী' বলে ডাকা শুরু হয়েছে। লড়াই যেন বাধে আর কি!

"দুর্ভিক্ষের ছায়া যেমন সৈন্যবাহিনীর বাইরে দেশের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, সৈন্যবাহিনীর ভেতরেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমরা কি খাদ্য পাচ্ছি তা তো স্বচক্ষে দেখছি। যেমন অখাদ্য-

কুখাদ্য, তেমনি তার স্বল্পতা। তা ছাড়া উর্দি-পোশাকের টানাটানি, তা নিয়ে আবার বিক্ষোভ। টাকাকড়ির টানাটানি। ফলে আমাদের সমস্ত বাড়ির পরিবার-পরিজন ঠিক সময়মতো আমাদের মাসিক মাহিনা বা ভাতা পাচ্ছেন না। তাঁদের না খেয়ে থাকতে হচ্ছে,—এই বিষয়ে আমরা তো অহরহই বাড়ি থেকে চিঠি পাচ্ছি। ফলে গোটা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভের এক প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়েছে। সামান্যতম ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধূমায়িত অসন্তোষ ফেটে পড়তে শুরু করেছে। আমাদের এখানে গত এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত চার-পাঁচটা ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে গত এপ্রিল মাসে এবং জানুয়ারিতে ঘটনার যে-রূপ দেখা গেল, তাতে বোঝা যায় নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহের অবস্থা বিদ্যমান। এ খবরও আমার কাছে আছে যে, অপর দুই বাহিনীও বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। তবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও মুক্ত করার জন্যই আমরা বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—এটা আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ভারতীয় পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তর আনয়নের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তাঁরাই তখন সমগ্র ভারতকে সুখী ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ভারতের মানুষ সুখের স্বপ্ন সফল করতে সমর্থ হবে। এ-পথ আপোষের পথ নয়, লড়াই-এর পথ। তাই আমাদের আমৃত্যু লড়াই-এর সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে এবং সেই মতো কর্মসূচীও গ্রহণ করতে কালবিলম্ব যেন না করি।”

মিঃ সাক্‌সেনা আবার বললেন, “সর্বভারতীয় গোপন সংস্থা আমাদের সামনে কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচী পূর্বেই রেখেছেন। আমরা সেই মতো আজও কাজ করে যাচ্ছি। অনেক কিছু আমরা করেছিও। তার ফলে সৈন্যবাহিনীর কর্মীরা দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগকে এখন আর ব্যক্তিগত বলে মনে করছে না। সবই যে রাজনৈতিক আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে এবং

এর মূল কারণ যে আমাদের দেশে ব্রিটিশের অবস্থান, তাও তারা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে বলেই তো তারা আজ নিজেদের 'আজাদ হিন্দী' (স্বাধীন ভারতীয়) বলে মনে করছে। ফলে মিলিটারীর মধ্যে যে কঠোর শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল তা আজ অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে। আমরা কি এর আগে কল্পনাও করতে পেরেছি যে, ব্রিটিশ অফিসারকে একজন সাধারণ ভারতীয়-সৈনিক মারধোর করতে পারে—যা ব্রিজলাল ও গফুর মোল্লা করেছে গত ২৮শে জানুয়ারি? আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে, হিন্দু-মুসলমান সৈনিক একত্র হয়ে। হিন্দু-মুসলমান যে আলাদা জাতি নয়, ভারত-জননীর দুই সন্তান মাত্র, তাও আজ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো। তারা দুই সম্প্রদায় হতে পারে, কিন্তু দুই জাতি যে নয় তা প্রমাণিত হলো। দ্বিজাতি-তত্ত্ব আজ আমাদের কাছে ভূয়া প্রমাণিত হলো। তা ছাড়া সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্যারাকের দেয়াল বা জাহাজের গায়ে রাজনৈতিক শ্লোগান্ লিখে পোস্টারিং করা পূর্বে কি কখনও কেউ কল্পনা করতে পেরেছি? তাও আমাদের মধ্যে হয়েছে। আর একটি কথা আমাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা কর্তব্য যে, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া দুই ভগ্নি—শ্রীমতী ঊর্মিলা বাঈ এবং শ্রীমতী অনুভা সেন আজ দেশের জন্যে কারান্তরালে অশেষ নির্যাতন ভোগ করছেন। জানি না তাঁদের ভাগ্যে কি অপেক্ষা করছে! তবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, তাঁরা মহান ভারত-জননীর পায়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত-প্রাণ; তাঁরা প্রাণ থাকতে কোন কিছুই স্বীকারোক্তি করবেন না। আমাদের কর্তব্য হলো, বিদ্রোহের চরম পর্যায়ে মুলন্দ বন্দী শিবির ভেঙে ব্রিটিশের কলঙ্কিত হাত থেকে তাঁদের মুক্ত করা।"

এর পরে মিঃ সাক্‌সেনা পাঁচখানা যুদ্ধ-জাহাজ যা আগামীকাল আফ্রিকা বর্ডারের দিকে যাত্রা করবে তার বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "আমরা যেন মনে না করি যে, ব্রিটিশ আন্তরিকতা

সহকারে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্যে ঐ জাহাজগুলোকে আফ্রিকা বর্ডারে পাঠাচ্ছে। ব্রিটিশের এ একটা চাল মাত্র। তারা এক গুলীতে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ একদিকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মিত্রপক্ষের দৃষ্টিতে সাহায্যের নামে সুনাম প্রতিষ্ঠা করা ; সে সাহায্য যতই অকেজো জরাজীর্ণ মান্ধাতা আমলের কামান-বন্দুক ও জাহাজ হোক না কেন। তারা শুধু দেখাতে চাইছে,—'আমি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছি, তোমরা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করো।' অপরদিকে, ব্রিটিশ সুকৌশলে ভারতীয় সৈন্যদের, যারা ব্রিটিশের চোখে 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রবর্তী বাহিনী করে পাঠানোর নামে সমুদ্রের মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছে। পরে প্রচার করা হবে যে, ঐ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। এই খবর গোপনপথে আমার কাছে এসেছে। এ খবর সত্য। ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'ভারত মুক্তির' রাজনৈতিক আদর্শ অনুপ্রবেশ করেছে। অতএব যেভাবেই হোক লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐ সমস্ত সৈন্যদের খতম করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার নতুন করে সাজাতে হবে,—আদর্শবিহীন নিরেট ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে। কেন না, এই সৈন্যবাহিনীই তো হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার মেরুদণ্ড। অতএব ব্রিটিশের এই অবাঞ্ছিত বাসনাকে আমাদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই কঠোর লড়াই-এর মধ্য দিয়ে ভেঙে চুরমার করে তাকে অতৃপ্ত বাসনায় রূপায়িত করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয়, বিপ্লবীদের এই বোধহয় চরম কর্তব্য।"

মিঃ সাক্সেনা এবারে বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তিতে কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব রাখলেন সদস্যদের সামনে। যদিও এই কর্মসূচী পূর্বেই এ্যাকশন কমিটিতে গ্রহণ করা হয়েছিল, তবুও আবার তাকে নতুন করে প্রস্তাব আকারে সভায় রাখা হলো এই জন্যে

যে, পূর্বে আমাদের প্রকাশ্য আন্দোলনের দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি। এবারে তা আরম্ভ হচ্ছে ১১ই ফেব্রুয়ারি। অবশ্য এও পূর্বে ঠিক হয়েছিল,—যেদিনই আমাদের আফ্রিকা বর্ডারে পাঠানো হবে সেই দিনই আমরা প্রকাশ্য আন্দোলনে নামব। সেখানে কোন নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা ছিল না। নতুনত্ব এইখানে যে, এবারে নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হলো। ফলে সমগ্র সৈন্যবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান) সর্বত্র কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার নেতৃত্বে আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারি নির্দেশিত প্রকাশ্য আন্দোলনের দিন পরিবর্তন করে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হচ্ছে। যদিও এটা নৌ-বাহিনীর সিদ্ধান্ত তবুও তা সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সিদ্ধান্ত মতোই কার্যকরী হবে। কেন না পূর্বেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ছিল যে, যেদিন নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ-জাহাজ আফ্রিকা বর্ডারে পাঠানো হবে, তা নির্দেশিত ১৮ই ফেব্রুয়ারির পূর্বে হলেও, সেই দিনই প্রকাশ্য আন্দোলন করতে হবে এবং তা পূর্বে গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তাঁরা (কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা) প্রস্তুত হতে পারেন অন্য দুই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি। মিঃ সাক্‌সেনা প্রস্তাব রাখলেন, "১৯৪৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সৈন্যরা সকালে তাদের চা-পান থেকেই খাদ্য গ্রহণ বর্জন করবে। কারণ, ব্যারাক-জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি রেটিং বা সৈন্য জড়িত থাকে। যে খাবার আমাদের দেওয়া হচ্ছে, সে তো শুধু খারাপই নয়, যেমনি অখাদ্য, তেমনি অরুচিকর। তার ওপরে রয়েছে খাবারের স্বল্পতা। এককথায় আমাদের খাবার নিকৃষ্ট, অপরিতৃপ্ত। সুতরাং খাবার গ্রহণ অস্বীকার করতে হবে। তাহলে সামগ্রিকভাবেই সৈন্যদের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক অনমনীয় ও তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামের স্পৃহা জাগবে।

তার কারণ হলো, তারা মনে করতে আরম্ভ করবে যে, খারাপ খাবার সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের (সৈন্যদের) 'কালা আদমী' বলে ঘৃণা করে সামগ্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে এক কঠোর শাস্তির বিধান করে রেখেছে। অতএব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একান্ত প্রয়োজন। সৈন্যরা যেহেতু খাবার গ্রহণ করবে না সেইহেতু কোন কাজও করা হবে না। মিঃ সাক্‌সেনা এই ভিত্তিতে শ্লোগান্ রাখলেন, 'নো ফুড, নো ওয়ার্ক' (No Food, No Work) অর্থাৎ 'না-খাবার, না-কাজ'। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ধাপে ধাপে পুরাপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে নেবে পড়ব। প্রয়োজনবোধে, শুধুই প্রয়োজনবোধে নয়,—প্রয়োজন হবেই ধরে নিতে হচ্ছে, প্রথমদিকে ব্যারাকের স্টোর-রুম ভেঙে যে সমস্ত অস্ত্র পাওয়া যাবে তা লুঠ করে সৈন্যদের হাতে তুলে দিতে হবে। পরে যখন আরও অস্ত্রের প্রয়োজন হবে তখন জাহাজগুলির এবং সমুদ্রতীরবর্তী অস্ত্রভাণ্ডার ভেঙে লুঠ করে সৈন্যদের এবং সমর্থিত জনগণের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে বৃহত্তর বিপ্লবের জন্যে। বিশ্বাস রাখুন,—জনগণ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই পর্যায়ে এসে আমরা শ্লোগান্ তুলব,—'ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'কংগ্রেস-লীগ এক হোক', 'এখনই বিদ্রোহ করো', 'আমরা সবাই আজাদ হিন্দী', 'গোরা সৈন্যদের হত্যা করো', 'দিল্লী চলো—এগিয়ে চলো', 'স্বাধীন ভারত—জিন্দাবাদ', ইত্যাদি পুরাপুরি রাজনৈতিক শ্লোগান্। অন্তর্ঘাতী কাজও চলবে সাথে সাথে।"

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার রিপোর্টিং করে এবং সময়োচিত কর্মসূচীর প্রস্তাবগুলি গ্রহণের আবেদন রেখে মিঃ সাক্‌সেনা নিজ আসনে বসে পড়লেন। প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত এস্. সি. ধর এবারে শেখ শাহাদত আলীকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আবেদন জানালেন। শেখ শাহাদত আলী উঠে দাঁড়িয়ে খুবই সংক্ষেপে

বললেন, "মিঃ সাক্সেনা (আমাদের এ্যাকশন কমিটির যিনি সেক্রেটারী, অর্থবা আরও ভালোভাবে বলা যায়, আমাদের নৌ-বাহিনীর যিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা) যা বললেন, তার প্রতিটি কথা বা শব্দ শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়, মর্মার্থের দিক থেকেও প্রণিধানযোগ্য। প্রতিটি কথা খাঁটি সত্য। কর্মসূচীর প্রস্তাবগুলিও সময়োচিত গ্রহণযোগ্য। আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু বলতে চাই যে, তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছি এবং উপস্থিত সকলে আলোচনা করে সর্বান্তঃকরণে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করুন—এই আবেদন রাখছি। মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম কিন্তু মৃত্যু-জয়ী সংগ্রাম।"

শেখ শাহাদত আলী তাঁর সমর্থন জানিয়ে নিজ আসনে বসে পড়লেন। সভাপতি এবারে সকলের ব্যক্তিগত মত গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। কেন না, তিনি জানেন, এই সংগ্রাম সাধারণ সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রাম জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। অতএব সকল সদস্যের ব্যক্তিগত মতামত জানা একান্ত প্রয়োজন। তিনি এও জানতেন, অনেকের ভাগ্যে হয়তো আজ রাত্রের মতোই খাদ্য গ্রহণ শেষ হবে। আর হয়তো তাদের জীবনে খাওয়াই হবে না। তাই তিনি ভালো করে যাচাই করতে চাইলেন। আমরা সবাই ভালোভাবে মৃত্যুর নিশানা জেনেই দু'হাত তুলে সর্বসম্মতি-ক্রমে সম্পাদকের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। কেননা মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, সেখানে বীরের মতো মৃত্যুকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভীরুতার মধ্যে মৃত্যু কলঙ্কস্বরূপ। এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বিপদ সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন ছিলাম। এই লড়াই-এর পরিণতি যে কী হতে পারে, তাও আমরা পূর্বাহ্ণেই আঁচ করে নিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, যা খাবার আজই খেয়ে নিতে হবে; আগামীকাল (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪) সকাল থেকে আর খানা খাব না—'খানা বন্ধ্'।

বিবিধ কর্মসূচীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, "এই রাত্রিরই সাড়ে বারোটার মধ্যে (আমাদের মিটিং চলেছিল রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত) আমাদের নৌ-বাহিনীর এ্যাকশন কমিটির নিজস্ব গোপন পথে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এই রাত্রির মধ্যেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে ঐ দুই বাহিনী (স্থল ও বিমান) ১১ই ফেব্রুয়ারি একই দিনে একই সময়ে 'খানা বন্ধ্'-এর কাজ শুরু করে।" সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশন কমিটির গুপ্ত-চ্যানেল্ এই পরিকল্পনাকে রূপদান করলো ১০ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে। মনে হলো ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ১৯৪৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি এগারোটায় এসে আমাদের কানে কানে যেন বলে গেল, "আমি মরিনি—আবার এসেছি ; ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে নতুন মূর্তিতে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হব। এতদিন তোদের জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলাম। তোরা আমার সাথী। এবারে আমি আমার সাথীদের ফিরে পেয়েছি। তাই, আজ আমার অফুরন্ত আনন্দ,—এ আনন্দ স্বর্গীয় আনন্দ !"

স্বর্গ যেন নেমে এলো আনন্দস্বরূপে ধরাধামে।

কবিও যেন গেয়ে উঠলেন আমাদের সাথে ঃ

> "ফুটলো রে ঐ সত্য-তপন অন্ধকারের পুঞ্জ নাশি,
> বাজলো দয়াল বিশ্বনাথের শাশ্বত ঐ মধুর বাঁশী॥
> শিউরে ওঠে সপ্ত ভুবন অমৃত তাঁর দৃপ্ত সুরে,
> হাঁক্ছে প্রভু বংশীনাদে, আর তো আমি নই রে দূরে॥
> কাঁদিস্‌নে আর শঙ্কা কিসের আর্ত কে রে দুঃখে ভুগে,
> 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'॥
> আসছে যে ওই গগন ছেয়ে আমার তনুর মধুর বায়ু॥
> স্পর্শে তাহার সঞ্জীবিত হবে আবার তোদের স্নায়ু।

বিশ্বভুবন কুঞ্জবনে কুসুম আমার গন্ধ আনে,
বার্তা আমার উঠছে যে ওই নবীন যুগের কবির গানে ॥
আর তো আমি নই রে দূরে দৈন্য কে আজ দুঃখে ভুগে,
'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' ॥
বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বরণে উঠছে যে ভীম অগ্নিশিখা,
সেইটি আমার বিজ্ঞাপনী হচ্ছে ক্রমে রক্তে লিখা ॥
পাপ-দানবীর অত্যাচারে ডাকছে যে নর ত্রাহি-ত্রাহি,
চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি ॥
নই রে দূরে আয় কোলে আয় কাঁদছে কে আজ দুঃখে ভুগে,
'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' ॥
সোনার সমাজ ডুবছে বলে দুঃখ কি তায় শঙ্কা কি রে,
মগ্ন তো নয় সৃষ্টি হবার নবীন আভাস আসছে ফিরে ॥
চলছে যে এক বিরাট সাধন বিশ্ব-হিয়ায় রাত্রি দিবা,
ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমে আসছি আবার শঙ্কা কিবা ॥
বিপন্ন কে আয় কোলে আয় ক্ষুৎপিপাসায় দুঃখে ভোগে,
'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' ॥"

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪। নতুন প্রভাতে দেখা দিল নতুন সূর্য। আরব সাগর তখনও শান্ত। মৃদুমন্দ হাওয়ায় সে আনন্দ লহরী ছড়াচ্ছে। তার বুকে অবস্থানরত 'ধনৌজ', 'কুমাওন্', 'আউধ্', 'মাদ্রাজ' এবং 'লরেন্স'—এই পাঁচখানা জাহাজ নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন্ করে আফ্রিকাতে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সকাল থেকেই হায়ার অফিসাররা তা নিয়ে ব্যস্ত। বেলা দু'টোয় ঐ স্কোয়াড্রন্ যাত্রা করবে। গোপন সূত্রে ঐ পূর্ব-কথাও আবার শোনা গেল, যাদের যাদের নাম পাওয়া গেছে এবং যাদের যাদের

কর্তৃপক্ষ 'বিপজ্জনক' বলে মনে করেন, সেই সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের ঐ জাহাজগুলোতে পুরে নিয়ে মাঝ-সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবে। পরে ঘোষণা করবে, যুদ্ধে মারা গেছে। আরও জানতে পারা গেল, আমাদের আপাততঃ মোট ষোল হাজার সৈন্য আর চার হাজার ছোট-বড় অফিসার ঐ পাঁচখানা জাহাজে পাঠানো হবে। কামান-বন্দুক, গোলা-গুলী-বারুদের পরিমাণও একেবারে কম নয়, তবে তা বেশির ভাগই অকেজো। এই সংবাদে রেটিংদের মধ্যে আরও বেশি করে বিক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি হলো। এদিকে আমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার প্রতি অটল, অনড় আস্থা রেখেই চলছি। আজ সকাল থেকেই 'খানা বন্ধ্'-এর ডাক। কয়েক রাত ধরেই ঘুম হচ্ছে না। এ-ব্যারাক্ সে-ব্যারাক্ করে ঘুরেছি। অবশ্য গা-ঢাকা দিয়ে। আরবসাগরে অবস্থিত জাহাজগুলোতে বেতার-সঙ্কেতে খবর পৌঁছানো হয়েছে। যে পাঁচখানা জাহাজ আফ্রিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলোতে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালানোর জন্যে সাতজন বিশ্বস্ত রেটিংকে নিয়োগ করা হলো প্রয়োজন মতো পূর্ব-নির্দেশিত পথে ধ্বংসাত্মক কাজগুলো সমাধানের জন্যে। মনে মাঝে মাঝে উদয় হতে লাগলো সবাই যেন প্রস্তুত হয়ে আছে।

আরম্ভ হয়েছে সকালের চা-পান-এর সময় থেকেই খানা বন্ধ্-এর কাজ। কেউ চা-পান-এর খাবার খেল্ না। রেটিংরা সবাই আনন্দিত। পূর্বাহ্ণে কর্তৃপক্ষকে কোন নোটিশ দিইনি আমরা। হঠাৎ করে আরম্ভ করার কথা ছিল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে। কেননা, মিলিটারীতে সাধারণভাবেও কোন যুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ দাবী অথবা আবেদন রাখা, আর ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করা,— একই কথা। এটাকে মিলিটারী নিয়ম-কানুনে 'বিদ্রোহ' বলেই আখ্যায়িত করা হয়। আমরা কিন্তু সেই 'বিদ্রোহে'র দিকেই পা বাড়ালাম মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও।

কর্তৃপক্ষের কানে গেল, আমরা সকালের চা-পান-এ বিরত আছি। আমি অফিসার র‍্যাঙ্কের লোক। আমাদের খাবারের জায়গা ছিল আলাদা। সেখানেও বেশির ভাগ ভারতীয় অফিসার চা-পান করেননি। সমস্ত ব্যারাকগুলিতে এবং জাহাজগুলিতে ঐ একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হলো। সর্বত্রই যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্বাবস্থা বিদ্যমান। আপাততঃ হাতে অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু প্রয়োজনে তাও নেওয়া হবে—সে প্রস্তুতিও হয়ে রয়েছে। আরব সাগরের তীরের জাহাজ-গুলিও বসে নেই। তারাও খানা বন্ধ্ করেছে। মহিলা ব্যারাকেও খানা বন্ধ্। বেতার-সঙ্কেতে শ্রীযুত মদনলাল সাক্‌সেনা করাচীকেও ব্যবস্থা নিতে বলে দিয়েছেন। খবর পাওয়া গেল, তারাও খানা বন্ধ্ করেছে। কর্তৃপক্ষ এবারে নেমে পড়লেন। প্রথমে জুনিয়র কম্যাণ্ডিং অফিসাররা ঘুরে ঘুরে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হলো না। ব্রিটিশ অফিসাররা কেউ আসেননি। তাঁরা পাঠিয়েছিলেন সেই ভারতীয় অফিসারদের (অবশ্য তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম), যাঁরা নিজেদের কেরিয়ারকে বিল্ড-আপ্ করতে চেয়েছিলেন সৈন্যদের তথা সমগ্র দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে। রেটিংরা ঘৃণাভরে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে। উল্‌টে তাঁরা জেনে গেলেন, নাবিকরা কোন খাবার গ্রহণ করবে না, যে-পর্যন্ত না তাদের দাবীগুলো পূরণ হচ্ছে। নাবিকদের দাবীগুলো কি,—জানতে চাওয়ায় কয়েকজন নাবিক তাঁদের নিয়ে এলো মিঃ সাক্‌সেনার কাছে। মিঃ সাক্‌সেনা এ্যাকশন কমিটির সম্পাদক হিসাবে তাঁদের সামনে লিখিতভাবে দাবীগুলো রাখলেন। দাবীগুলো হলো ঃ

১। ব্রিটিশ সৈন্যের সমকক্ষ ভাল খাবার চাই।

২। ব্রিটিশ সৈন্যের সমকক্ষ ভাল পোশাক চাই।

৩। হেড্-কোয়ার্টার থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের দু' তারিখের মধ্যে প্রত্যেক সৈন্যের (নাবিকদের) বাড়িতে বেতন পাঠিয়ে দিতে হবে।

৪। ব্রিটিশ সৈন্যের সাথে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা চলবে না।

৫। যে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হবে বা নির্দোষ বলে ছেড়ে দিতে হবে।

৬। সৈন্যবাহিনীকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, —ইত্যাদি।

জুনিয়র কম্যাণ্ডিং অফিসাররা সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য সহানুভূতি না দেখিয়ে উপায়ও ছিল না। একে তো ভারতীয় অফিসার, তার উপরে আবার এসেছেন ভারতীয় নাবিকদের আন্দোলনকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ভেঙে দিতে। ফলে নাবিকদের কাছে তাঁরা দালালরূপে পরিগণিত হয়েছেন। নাবিকদের বর্তমান মনের যে অবস্থা, তাতে যদি এতটুকুও বেফাঁস কথা বলতেন বা অন্য কোনপ্রকার নাবিকদের স্বার্থবিরোধী কাজ হাতে-কলমে করতেন তাহলে নাবিকদের হাত থেকে তাঁদের পিঠ বাঁচানো দায় হয়ে উঠতো। এমনকি সম্পাদকের কথাও নাবিকরা শুনতো না—বর্তমান অবস্থা দাঁড়িয়েছে এইরূপ।

দুপুর গড়িয়ে একটা বাজলো। রান্না-করা খাবারগুলো পড়ে আছে। পূর্বের তৈরি চা এবং অন্য খাবারগুলোও ইতিপূর্বে নষ্ট হয়েছে। কেউ খেতে গেল না। সবদিকেই একটা সাজ-সাজ রব। সমুদ্রতীরবর্তী নৌ-বাহিনীর যতগুলো সংগঠন ছিল সমস্ত সংগঠনই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সকলেই খানা বন্ধ্ করেছে। চতুর্দিকেই যেন বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগলো। ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে যেখানেই গোরা সৈন্যদের বা ইউরোপীয় অফিসারদের দেখতে পেল সেখানে সেখানেই

সাধারণ রেটিংরা তাদের টিট্‌কারি মেরে 'টমী' বলে উপহাস করতে লাগলো। ফলে কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, গোরা সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ ব্যারাকের আস্তানায় যেন আত্মগোপন করে রইলো। এতে রেটিংদের মধ্যে আরও উৎসাহের সঞ্চার হলো। এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল, ক্যাপ্টেন্‌ ইনিগো জোনস্‌ (কম্যাণ্ডিং অফিসার) একদল গোরা সৈন্য নিয়ে এম. আর. ব্যারাক্‌স-এ (সেখানেও খানা বন্ধ্‌-এর আন্দোলন চলছিল) কোনপ্রকার সতর্ক না করে নিরস্ত্র ভারতীয় সৈন্যদের ওপরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরাও মরিয়া হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে গোরা সৈন্যদের বাধা দিচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণের কৌশল জোরালোই ছিল। তাতে সেখানে দু'জন গোরা সৈন্য আহত হয়েছে। লড়াই জোর কদমে চলছে। আরও শোনা গেল, যে-দু'জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের খবরাখবর বের করার জন্যে ভীষণভাবে তাঁদের ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছে। তবুও তাঁরা কিছুই বলেননি। তাঁরা নাকি বলেছেন, 'মরব তবু কিছুই বলব না।' শুনে ভাবলাম, সত্যিই তাঁরা আদর্শস্থানীয়া। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই নত হলো। ক্রমে এই সংবাদও বায়ুর বেগে ছড়িয়ে পড়লো আগুনের ফুল্‌কি হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদের মধ্য থেকে শ্লোগান্‌ উঠলো, "Quit India" (ভারত ছাড়ো)। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক শ্লোগান্‌ এসে গেল। সব কিছুই যেন বেসামাল হয়ে পড়লো।

ওদিকে এম. আর. ব্যারাক্‌স-এর ওপরে গুলী চালাবার আদেশ হয়েছে। গুলী চলছে। ক্যাসেল্‌ ব্যারাকের ভারতীয় সৈন্যরা যখন শুনলো, এম. আর. ব্যারাক্‌স-এর ওপরে গুলী চলেছে, তখন তারা দলবদ্ধভাবে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্লোগান্‌ দিতে দিতে (শ্লোগান্‌ ছিল, 'ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো', 'গোরাদের হত্যা

করো', 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করো' ইত্যাদি) এগিয়ে যেতে থাকলো ক্যাসেল্ ব্যারাকের স্টোর-রুমের দিকে। সেখানে এসে স্টোর-রুম আক্রমণ করলো। যদিও সেখানে খুব বেশি অস্ত্রশস্ত্র থাকতো না, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই, তবু যতটা পাওয়া যায় প্রথম পর্যায়ের সাথী হিসাবে। অবশ্য সবই পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল। সেখানে বাইরে পাহারারত ভারতীয় সৈন্যরা দরজা খুলে দিলে বিদ্রোহী সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে দু'জন পাহারারত গোরা সৈন্যকে হত্যা করে এবং সেখানে রক্ষিত সামান্য অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে এম. আর. ব্যারাক্স-এর দিকে মারমুখো হয়ে ছুটে গিয়ে গোরা সৈন্যদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলী চালাতে থাকে। বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলো। ভারতীয় রেটিংদের এইরূপ বেপরোয়া সাহসই ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশরা কিন্তু এতটা হতে পারে তা কল্পনাও করেনি। তাই তারা একটু দিশেহারা হয়ে পড়লো। উভয় পক্ষেই কিছু হতাহত হলো। ব্রিটিশ সৈন্য—এমন কি স্বয়ং মিঃ ইনিগো জোনস্ মনে করেছিলেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ভারতীয় সৈন্যদের ওপরে আক্রমণ চালালে ভীরু ভারতীয়রা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু ভারতীয়দের রক্তেও যে লড়াইয়ের স্রোত বইছে তা মিঃ জোনস্ ভুলে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ভাঙলো ভারতীয়দের অদ্ভুত সাহস দেখে। এমন কি এই সাহস দেখে আক্রমণকারী উপহাসের পাত্র 'টমী'রাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্বেও বলা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে বা কার্যক্ষেত্রে যোগ্য'তায় ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম ছিল। এও তার একটি প্রমাণ। ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্ রণনীতির কৌশলের বিচারে ঠিক করলেন, এম. আর. ব্যারাক্স-এর গোরা সৈন্যদের ওপর থেকে ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণের চাপ কমাবার জন্যে আর একদল গোরা সৈন্য নিয়ে অন্যপথে এসে ক্যাসেল্ ব্যারাক্ আক্রমণ করবেন। আক্রমণ

করেও বসলেন। ক্যাসেল্ ব্যারাকে অবস্থানরত রেটিংদের কয়েকজন ছুটে গেল 'তলোয়ার'-এর পরিবহণ সংস্থায় খবর দিতে। সেখানে খবর দিয়ে তারা ছুটে গেল 'তলোয়ার' জাহাজে। সেখান থেকে আবার ছুটে গেল সমুদ্রতীরের অন্যান্য জাহাজ এবং সংগঠনগুলোতে খবর পৌঁছতে। তাঁরা লাউডস্পীকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে বলছিলেন, "ভাইসকল, আমরা কেবল নিজেদের জন্যই এ যুদ্ধ করছি না—করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য—তাই এ যুদ্ধ তোমাদের সকলের। ঝাঁপিয়ে পড়ো। কালবিলম্ব করো না। এম. আর. ব্যারাক্‌স ও ক্যাসেল্ ব্যারাক্ গোরা সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে আমাদের ভাইয়েরা জোর লড়াই করছে। 'টমী'রা আমাদের অনেক ভাইকে সেখানে গুলী করে মেরে ফেলছে। ভাই-এর রক্ত ঝরছে সেখানে। আমরা কি চুপ করে থাকতে পারি! তাড়াতাড়ি ছুটে এসো। গোরাদের হত্যা করো। এই দেশ থেকে ব্রিটিশকে চিরতরে হটিয়ে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করো।" ঠিক এই সময়েই সমুদ্রে অবস্থিত যে পাঁচখানা যুদ্ধ-জাহাজ আফ্রিকায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সেই পাঁচখানা জাহাজেই হঠাৎ বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল। জাহাজ ক'টি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এতে অবস্থা আরও ভীষণ আকার ধারণ করলো। রোষাগ্নি চরমে উঠলো। ক্যাসেল্ ব্যারাকে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যরা জোর কদমে যুদ্ধ করছে। এখানেও উভয় পক্ষ অস্ত্র ধারণ করেছে এবং জোরালো যুদ্ধ হচ্ছে। অনেকে মারা গেল, অনেকে আহত হলো। বড় রকমেরই এক যুদ্ধ বাধলো। লোক-মারফৎ খবর পেয়ে 'তলোয়ার' জাহাজের পরিবহণ সংস্থার এবং অন্যান্য জাহাজের ও সংস্থার ভারতীয় সৈন্যরা ছুটে এসে, 'এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, এ যুদ্ধ তাদের মুক্তির যুদ্ধ', মনে করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোরা সৈন্যের তথা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করতে লাগলো, যার যা হাতে ছিল তা দিয়েই। অস্ত্র তাদের হাতেও

ছিল। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রতীরের অন্যান্য নৌ-বাহিনীর সংগঠন-গুলোতেও এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো। বেতার-সঙ্কেতে খবর পাওয়া গেল, একটু দূরে করাচীতেও খানা বন্ধ্-এর আন্দোলন এখন সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। সেখানেও অনেক হতাহত হচ্ছে। করাচীসহ গোটা নৌ-বাহিনী আজ রণক্ষেত্রে পরিণত। যুদ্ধ চলছে সর্বত্র।

বিপ্লবীরা মনে করতেন, কংগ্রেসের 'গণ-অভ্যুত্থান আইন-অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দুর্বার ও দুর্জয় হয়ে উঠবে দেশ। আর বিপ্লবীরা সেই আইন অমান্যের ক্ষেত্রকে বৃহত্তর সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ-রেখায় টেনে নিয়ে যাবে। এখানেও সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলো খানা বন্ধের মধ্য দিয়ে। আর তার পরিণতি লাভ করলো সশস্ত্র সংগ্রামে। কিন্তু সংগ্রামের জন্য চাই গণ-সমর্থন ও স্বদেশপ্রেম। তাও আবার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে সংগ্রামী মন ও সংগঠন। যারা চলে তাদেরই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ। সেই জেগে-ওঠা পথ ধরেই এগোতে লাগলাম আমরা। পথের শেষ কোথায় তা জানিনে।

এবারে ব্রিটিশ সৈন্যদের দেখা পাওয়া ভার হলো। দেখতে পেলাম, পঁয়ত্রিশ জন গোরা সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে। আর আহত হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে ৩০০ জন। ভারতীয় সৈন্যও মারা গেছেন এগারো জন, আহত হয়ে পড়েছেন ২২৫ জন। এখন আর গোলা-গুলীর বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। সর্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করছে। প্রকৃতিও যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অস্তমিত হলো ১১ই ফেব্রুয়ারির লাল সূর্য। আমরা (এ্যাকশন কমিটির সদস্যরা) আহত সৈন্যদের ব্যারাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলাম আর নিহতদের মরদেহ রেখে দেওয়া হলো সনাক্ত করার জন্যে। স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের শ্রদ্ধা জানালাম নতজানু হয়ে, আর প্রতিজ্ঞা করলাম, "দেশজননীর শৃঙ্খল মোচন করে, পরাধীনতার

অভিশাপ দূর করে এই শহীদদের অমর আত্মার শান্তি লাভ করাব।" এর পরে আমরা পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। কেননা, আমরা জানতাম, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোরা সৈন্যদের উধাও হবার উদ্দেশ্য একটিই হতে পারে, তা হলো বেশি করে শক্তি সঞ্চয় করে অতর্কিতে রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ওপরে আক্রমণ করা। বর্তমান অবস্থায় আমরাই ছিলাম বেশি শক্তিশালী। সমস্ত ব্যারাক্, জাহাজ এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো তখন আমাদের করায়ত্বের মধ্যে। এক কথায় বলা যায় এখন আমরাই যেন সর্বেসর্বা। একটি ইংরাজেরও দেখা পাওয়া গেল না। আমরাও ঠিক করলাম, নিরাপত্তা বাহিনীকে এড়িয়ে যুদ্ধের জন্যে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্রের এবং লোকবলের তার জন্যে প্রস্তুতি চালাতে থাকব। সমুদ্রতীরে বড় বড় অস্ত্র-ভাণ্ডারগুলো এবং জাহাজের অস্ত্র-ভাণ্ডারগুলো লুঠ করে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে তুলে দেবার পরে যা থাকবে তা সৈন্যবাহিনীর বাইরে, বিশেষ করে নৌ-বাহিনীর বাইরে যে সব জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করছেন, তাঁদের হাতে গোপন সংস্থার মাধ্যমে যাঁচাই করে দেওয়া হবে, যাতে করে তাঁরাও আমাদের সাথে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামতে পারেন। অস্ত্র-ভাণ্ডার লুঠের জন্যে বেশ বড় একটি বাছাই করা ভারতীয় সৈনিক দল ঠিক করা হলো। আরও ঠিক হলো, গভীর রাত্রিতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরাই প্রথমে বড় একদল ভারতীয় সৈন্য দ্বারা অতর্কিতে ফ্লাগশিপ আক্রমণ করে ফ্লাগ-অফিসারসহ সমস্ত ইংরাজ অফিসার ও গোরা সৈন্যদের বন্দী করে ফেলব। পরে গোপন সংস্থার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেব। কারণ, আমরা তখনও জানতাম, এই বিদ্রোহ শুধু নৌ-বাহিনীতেই হয়নি, বাকী দুই বাহিনীতেও (স্থল ও বিমান) বিদ্রোহ হয়েছে একই দিনে। অতএব সেখানেও তো অনেক ইংরাজ অফিসার এবং সৈন্য বন্দী

হবেই। তাই সমস্ত বন্দীদেরই বিচার হবে একসঙ্গে এবং তা হবে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সিদ্ধান্ত মতো। সর্বোপরি গোটা পরিকল্পনার রূপায়ণই হবে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সরকারের দ্বারা। এইভাবে আমরা পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ব্যারাকে ব্যারাকে জাহাজে জাহাজে। অস্ত্রাগারগুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে ছুটে গেলেন মিঃ সাক্‌সেনা এবং মিঃ এস্. সি. ধর।

কাল নিরবধি। আমাদের প্রস্তুতির অপেক্ষায় কাল বসে নেই। তার নিজস্ব নিয়ম মতোই সে চলছে। ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাট্‌ট্রে খবর পেয়ে (সমস্ত দিনের নৌ-বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের ঘটনার খবর) এক বিরাট গোরা সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন ক্যাসেল্ ব্যারাকের দিকে এবং এম. আর. ব্যারাক্‌সসহ সমস্ত ব্যারাকগুলি ঘিরে ফেললেন সৈন্যবাহিনী দ্বারা। কারো আর পালাবার পথ ছিল না। যাকে যেখানে যে অবস্থায় পেয়েছিল, তাকে সেই অবস্থায়ই গ্রেপ্তার করলো। করাচীতেও ঐ একই ঘটনা ঘটেছিল। ভারতীয় সৈন্য গ্রেপ্তার বরণ করলো মোট ৫,৫০০ জন (বোম্বে এবং করাচী মিলিয়ে)। এবারে আমিও আর রেহাই পেলাম না। গ্রেপ্তার বরণ করতে বাধ্য হলাম। পর্যাপ্ত অস্ত্র তখনকার মতো হাতের কাছে না থাকায় এই পরাজয় মেনে নিতে হলো। বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্বেই আমরা ধরা পড়ে গেলাম। যে অস্ত্র প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল তা পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে অস্ত্রভাণ্ডার ভাঙার সুযোগ না দিয়েই মিঃ র‍্যাট্‌ট্রে অতর্কিতে ব্যারাক্ ও অস্ত্রভাণ্ডার-যুক্ত জাহাজগুলো ঘিরে ফেলেছিল। নতুবা পরিকল্পনা ছিল—ঐ স্তব্ধতার মধ্যে যখন কোন ব্রিটিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না,—এই সুযোগে অন্ধকারে প্রথমে বড় বড় দু'টো অস্ত্রভাণ্ডার লুঠ করা হবে।

প্রয়োজনে বাকীগুলোকেও লুঠ করব। কিন্তু বিধি হলো বাম। সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। ব্রিটিশের রণচাতুর্ষ অনুকরণীয়ও বটে!

রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাট্রে বিচক্ষণ ও কূটনীতিবিদ। তিনি চাতুরী করে ভান দেখিয়ে সর্বত্র শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্কে বদলী করে সেখানে নিয়ে এলেন কম্যাণ্ডার কিংকে। কারণ, তিনি রেটিংদের দেখাতে চাইলেন, ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্ কোনরকম সতর্ক না করে প্রথমেই গুলী করার আদেশ দিয়ে অন্যায় করেছেন। তাই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হলো বদলী করে। মিঃ র‍্যাট্রে মন্তব্য করলেন, "ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্ একদল গোরা সৈন্য নিয়ে এম. আর. ব্যারাক্স এবং ক্যাসেল্ ব্যারাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কোনপ্রকার সতর্ক না করে আদেশ দিলেন, 'On fire!' গোরা সৈন্যরা আদেশ পালন করলো বড় বড় ম্যাস্কেট্রীর (রাইফেলের) গুলী ছুঁড়ে— 'ট্যাট-ট্যাট, ট্যাট-টট-টট-টট!' Very sad!" রেটিংদের অসন্তোষ কিন্তু প্রশমিত হলো না। বরং তা ক্রমেই বেড়ে চললো। তারা মিঃ র‍্যাট্রের চাতুরী বুঝে নিয়েছিল। কেননা, যে দাবী তারা রেখেছিল তার কোনটাই মেনে নেওয়া হলো না, অপরদিকে রেটিংদের শাস্তিদানের ব্যবস্থাই পাকা করা হলো। প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাবে সাময়িকভাবে পিছু হটলেও ভারতীয় সৈন্যদের মনের ক্ষোভ দমিত হল না আবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হলো। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাও তাঁর প্রতিপালনীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হতে পারেননি—এই মন্তব্যও বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, যে সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের ওপরে অর্পিত হয়েছিল, তা তাঁরা পালন করেননি। অবহেলাই দেখিয়েছেন।

মুলন্দ বন্দী-শিবির। আমার পোশাক থেকে পোর্ট-অফিসারের ব্যাজটি খুলে নেওয়া হলো। আমি বিচারাধীন বন্দী। বিচার

হচ্ছে কোর্ট-মার্শালে। দিনের পর দিন চললো বিচারের নামে প্রহসন। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে কোন কোন হায়ার অফিসার এসে আমাকে এটা করেছ—ওটা করেছ, বলে প্রশ্ন করেন। আমি কোন কিছুই উত্তর না দিয়ে শুধু বলি, "আমি আমার দেশকে ভালোবাসতে জানি, অন্য কিছুই জানিনে।" এর পর তাঁরা চলে যান। বাইরের কোন খবর আর পাচ্ছি না। কোথায় কি হচ্ছে কিছুই জানতে পারছি না। তবে বন্দী-শিবিরের যে 'সেলে' (cell) আছি, সেখানে এক ভারতীয় সৈন্য গার্ড হয়ে এসেছে। তার কাছে জানতে পারলাম, খাবারের মেনু কিছুটা পাল্‌টে গেছে। পূর্বের তুলনায় কিছুটা ভালো খাবার দেওয়া হচ্ছে। একটু সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে যে, আমরা কিছুটা জিতেছি। সম্মুখ-সমরে পিছু হটেছি বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, তথা প্রশাসনিক পর্যায়ে ব্রিটিশের সামগ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করতে পেরেছি,—এ অতীব সত্য; এবং এ বলতে বাধা নেই যে, এই আলোড়নের পরিণতি যা হতে পারে তা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে কম লাভজনক নয়। জয় আমাদের হলো সেখানেই।

ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ আমার অতীতের কার্যকলাপের খবর পেয়ে গেছেন। তার প্রমাণ পেলাম গ্রেপ্তার হবার পনেরো দিন বাদে। ২৭.২.৪৪ তারিখে বেলা ৩টার সময়ে আমাকে কম্যাণ্ডার কিং-এর সামনে হাজির করা হলো। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "You have done many things against On His Majestic's Service i.e. Government of India in the year 1935-1938, then 1942-1943 February; and, here also today. I see, it is your traditional growth,—is it not true?" এই কথার উত্তরে আমি শুধু বলেছিলাম,—"Yes, I admit, my traditional growth is to love my beloved

motherland i.e., beloved India.” কি বুঝলো জানি না, তবে দেখা গেল, এর পর থেকেই ক্রমে যেন আমার ওপরে মারমুখো হয়ে উঠতে লাগলো। আমাকে যেন আর সহ্য করতে পারছে না।

১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ। হঠাৎ সকালবেলায় দেখা গেল আমার 'সেল' (**cell**)-এর গরাদ খুলে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে এলো বন্দী-শিবিরের মধ্যে খোলা মাঠে। বন্দী-শিবিরের কাঁটা-তারের পেছনে আবার পাথরের দেওয়াল, দু'য়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা সেখানে উঁচু পাটাতনে বন্দুকধারী গোরা সৈন্য বিচরণ করছে। আলো জ্বলছে দেওয়ালের ওপরে তখনও। তা আবার সার্চ-লাইট। খোলা মাঠে আরও অনেককে আনা হয়েছে বিভিন্ন 'সেল' থেকে। তাঁদের মধ্যে মিঃ মদনলাল সাক্‌সেনা এবং মিঃ এস্‌. সি. ধরকেও দেখতে পেলাম। আর ছিলেন সেই তেজস্বিনী মহিলাদ্বয়, শ্রীমতী উর্মিলা বাঈ ও শ্রীমতী অনুভা সেন।

কিছুক্ষণ পরেই কম্যাণ্ডার কিং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে হাজির হলেন। ডাণ্ডা-বেড়ি পরানো অবস্থায় আমাদের মার্চ করিয়ে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। কড়া পাহারা রাখা হয়েছে চারদিকে। 'ফল ইন্‌'-এর সামনে কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডার কিং (কিছু পরেই ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস্‌ও এসে উপস্থিত হলেন। মিঃ র‍্যাট্‌ট্রের চাতুরী আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়লো।) পড়ে যেতে লাগলেন কোর্ট-মার্শালের 'রায়'। রায় ইংরাজীতেই লেখা ছিল। তার মোদ্দা কথা হলো—“ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ঐ মহিলা দু'জনকে গুলী করে (সট্‌-ডেথ) হত্যা করা হবে এবং আমাকে নিয়ে মোট এক হাজার পাঁচশ' জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড (আর. আই.—রিগোরাস ইমপ্রিজন্‌মেণ্ট টিল্‌ ডেথ্‌) ভোগ করতে হবে। এই

কারাদণ্ড চলবে 'মুলতান' মিলিটারী জেলে।" (বর্তমানে এই জেল পাকিস্তানে।)

বিস্ফোরণোন্মুখ বারুদের স্তূপের মতো শান্ত, কালবৈশাখী আসার পূর্ব মুহূর্তের পৃথিবীর মতো নিশ্চল, হিমালয়ের মতো ধীর স্থির; অসম্ভব তাঁদের সংযম, অদ্ভুত তাঁদের মানসিক স্থৈর্য। এতদিন যে-স্বপ্নের সাধনায় তাঁরা বিনিদ্র রজনীর প্রহর গুনেছেন, নিজের জীবন ও জাতির ইতিহাসকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে ভীরুতার অপবাদ মুছে ফেলবার জন্যে যে-সাধনায় যে-আরাধনায় জীবন-পণ প্রতীক্ষায় উদ্বেগ নিয়ে বসে ছিলেন,—জীবনের সেই পরম লগ্ন, সেই শুভক্ষণ বুঝি তাঁদের সমাগত। তাই বোধহয় তাঁদের—সেই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী মহান দেশপ্রেমিকা বীরাঙ্গনা মহিলাদ্বয়ের অন্তরে-বাইরে এই প্রশান্তি, এই তৃপ্তি। মনে হলো, তাঁরা যেন হৃষ্টচিত্তেই উক্ত রায়কে গ্রহণ করলেন, আর বললেন,—"আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।"

রায় পাঠ করার পাঁচ মিনিট পরেই এ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। আমাদেরই সামনে 'চাঁদমারি' করে নিষ্ঠুরভাবে এই দুই মহিলাকে চারজন গোরা সৈন্য একসাথে গুলী করে হত্যা করলো। গুলীর আঘাতে তাঁদের মরদেহ চাঁদমারির দেওয়ালের গায়ে লুটিয়ে পড়লো। তাজা রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে গড়াতে লাগলো। তাঁদের মহান বীর আত্মা শান্তিলাভ করলো অমর হয়ে। কিন্তু কী নিষ্ঠুর পরিহাস, আমরা কিছুই করতে পারলাম না! শুধু ভারতীয় স্বাধীনতার মহান যোদ্ধা হিসাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম। মহারাষ্ট্রের এবং পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) দুই মহিয়সী নারী আমাদের কাছ থেকে নীরবে বিদায় নিলেন। গুলীতে আত্মাহুতি দেবার পূর্ব মুহূর্তে উচ্চৈঃস্বরে শুধু বলেছিলেন,—"ভারতের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, জয়হিন্দ্!" দুর্ভাগ্য আমার, এঁদের পুরো ঠিকানা জানবার সুযোগ আমার ছিল না। এর পাঁচ মিনিট পরেই

ডাণ্ডা-বেড়ি পরানো অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে গার্ড দিয়ে মার্চ করিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রেল-স্টেশনে। কালবিলম্ব না করে অপেক্ষমাণ একটি ট্রেনে আমাদের চাপিয়ে নিয়ে গেল মুলতান মিলিটারী জেলে।

মুলতান মিলিটারী জেলকে যমপুরী আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, ১৯৪৪। এখানে দেখা পেলাম মিঃ চন্দ্র সিং গাড়োয়ালের। তিনি এখানে আমার আসার তিনদিন আগে এসেছেন। তাঁর মুখে শুনতে পেলাম, স্থল-বাহিনীতে তিনি সেই নির্দিষ্ট ১৮ই ফেব্রুয়ারিতেই আন্দোলন শুরু করেন। তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেকে সেই খণ্ডযুদ্ধে মারা গেছেন। অবশেষে প্রবল শক্তির সাথে পাল্লা দিতে না পেরে এবং ভবিষ্যতে শক্তি অর্জন করে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জয়ের আশায় তাঁর অনুগত পাঁচশ' সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানেও ব্রিটিশ সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁর অতি গোপন আস্তানা ঘেরাও করে ফেলে। ঐ গোপন আস্তানা প্রকাশ হয়ে পড়ায় মিঃ গাড়োয়াল বাধ্য হলেন আবার সম্মুখ-যুদ্ধে দাঁড়াতে। এখানেও এক বড় রকমের খণ্ডযুদ্ধ হলো। অনাহার-অনিদ্রা, গুলী-গোলার অভাব, তার ওপরে প্রধান বস্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাব থাকায় পরিশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সেই অনুগত পাঁচশ' সৈন্যের মধ্যে মাত্র ছত্রিশ জন বেঁচে ছিলেন। আর সকলেই হিমালয়ের যুদ্ধে মারা গেছেন। ঐ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষেরও একশ' বিরানব্বই জন গোরা সৈন্য মারা যায়। মিঃ গাড়োয়াল বললেন, ঐ হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে গোপন আস্তানার নিশানা ঠিক করে ব্রিটিশ পাইলটদের দিয়ে

বোমারু প্লেন্ থেকে বেশ কিছু ভারী বোমা ফেলা হয়েছিল। তার ফলে সেখানে বড় বড় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। লুইস্‌গান ও মেশিনগানের ব্যবহার তো ছিলই। অদৃষ্টের পরিহাসে এমনই বিপর্যয় দেখা দিল যে, মিঃ গাড়োয়ালের নিজের রাইফেলেও এমন একটিও গুলী ছিল না, যা দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। দেহের বহুস্থানে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় বাধ্য হলেন ধরা দিতে। কোর্ট-মার্শালের রায়-এ তিনি এবং তাঁর সহযোগী ছত্রিশ জন বীর স্বাধীনতা-সংগ্রামী আজ মুলতান মিলিটারী জেলে এসেছেন বাকী জীবনটুকু যাপন করতে।

তিনি আক্ষেপ করে আবার বললেন,—"আমার মরতে আপত্তি নেই, যদি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত করতে পারতাম। ১১ই তারিখের নৌ-বিদ্রোহের সাথে আমরাও যদি যুদ্ধ শুরু করতে পারতাম, তাহলে ব্রিটিশ একসঙ্গে স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীতে গোরা সৈন্য লাগিয়ে আমাদের পরাজিত করতে পারতো না। গোরা সৈন্যের মোট সংখ্যা সেই অনুপাতে কম ছিল। একসঙ্গে তিন সেক্টরে গোরা সৈন্য নামানো সম্ভব হতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ১১ই তারিখের যুদ্ধারম্ভের খবর গোপন সংস্থার মারফৎ আমরা পেলাম ১৮ই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা বেলায়। অথচ পূর্ব-নির্দিষ্ট ১৮ই ফেব্রুয়ারি সকালবেলা থেকেই 'খানা বন্ধ্'-এর আন্দোলন আরম্ভ করায় আমরা আইসোলেট হয়ে পড়লাম। নৌ-বিদ্রোহীদের দমন করে সেই গোরা সৈন্যদের কাজে লাগানো হলো স্থল ও বিমান-বাহিনীর বিরুদ্ধে। তার ফলে আমরা সবাই পরাজিত হলাম। নেমে এলো মৃত্যুর পরোয়ানা। এর জন্যে কে বা কারা দায়ী,—সে বিতর্কে না গিয়ে এইটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে আন্দোলনের প্রস্তাব ১০ই ফেব্রুয়ারির গভীর রাত্রেই (নৌ-বাহিনীর ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব,—১০ই

ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অফিসে এসে যায়) শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই-এর ওপরে স্থল ও বিমান-বাহিনীর এ্যাকশন কমিটি দু'টির কাছে গোপন পথে পেঁৗছনোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা পেঁৗছলেন ১৮ই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যাবেলায়। আমাদের দায়িত্ববোধ যদি এইরূপ থাকে তবে ভারতমাতা মুক্ত হবেন কি করে? আর, যদিও বা তিনি মুক্ত হন কোনও অজ্ঞাত কারণে, তাহলেও তিনি (ভারতমাতা) চির-সুখী হতে পারবেন না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

বিমান-বাহিনীর মিঃ পি. কোট্টায়াম-এর দেখাও পেলাম এখানে আসার সাতদিন পরে। শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন আরও পঞ্চাশ জন সহযোগী যোদ্ধা। সেখানেও ঐ নির্দিষ্ট ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের প্রস্তাব তাঁরা পেয়েছেন ১৮ই ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টার সময়। ফলে তাঁরাও আমাদের মতো অকৃতকার্য হয়েছেন। মিঃ পি. কোট্টায়াম বললেন, "আমরা, ভারতীয় পাইলটরা এবং গ্রাউণ্ড-ইঞ্জিনীয়াররা ও অন্যান্য কর্মীরা সবাই 'খানা বন্ধ্' করে ফাইটার বিমানে বসে ছিলাম বোমাসহ প্রস্তুত হয়ে। আশা ছিল, প্রয়োজনে কাজে লাগাব। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার যোগাযোগ-কারী সদস্য মহাশয় ১৮ই ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টা নাগাদ ১১ই ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের প্রস্তাবের অনুলিপি আমার হাতে দিয়ে বললেন,—এই চিঠিটি পৌঁছতে দেরী হলো বলে আমি দুঃখিত। তবে নৌ-বাহিনীতে আন্দোলন হয়েছিল এবং তা মিটে গেছে। এখন সব শান্ত। আপনারাও আন্দোলন করছেন, ভালোই হয়েছে। তবে খেয়াল রাখবেন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবেন না। অল্পের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন।" মিঃ পি. কোট্টায়াম্ যেন প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তিনি অপ্রস্তুত হলেন দু'টি কারণে। তিনি বললেন, "প্রথমতঃ ১১ই ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের

খবর আজ (১৮ই ফেব্রুয়ারি) পেলাম। প্রথম পরাজয় তো এখানেই হলো। এখন আমাদের ওপরে আক্রমণের পালা। তাও বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, একজন কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদস্য হয়ে কী করে ঐ ধরনের প্রস্তাব আমার কাছে রাখলেন! বিশেষ করে আমি নিজে যেখানে সেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার একজন সদস্য? তা ছাড়া এইরকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে গোপন সংস্থার সদস্যদের মিলিত বৈঠকেই তো তা নেওয়া সমীচীন,—এককভাবে কেন?" এই-ভাবে আক্ষেপ প্রকাশ করে আবার বললেন, "আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। দেশাত্মবোধ স্বপ্ন-বিলাস থেকে আসে না, কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়েই তার জন্ম। আর তা জন্মগত বৈশিষ্ট্যও বটে।"

তাঁর কাছে শুনতে পেলাম, "সন্ধ্যার অন্ধকারে অতর্কিতে গোরা সৈন্যের দল তাঁদের ওপরে বম্বার্ড-কার ও মেশিনগান-এর গুলী নিয়ে আক্রমণ চালায় এবং কোনরকম অস্ত্রধারণের সুযোগ না রেখে ব্রিটিশ পাইলট দিয়ে বোমারু ফাইটার প্লেন্ আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হলো আক্রমণের নিশানা দিয়ে। উপর থেকে বোমা ফেলাও হয়েছিল, তার ফলে ঘটনাস্থলেই পঁচাত্তর জন ভারতীয় গ্রাউণ্ড্-কর্মী, সাতজন গ্রাউণ্ড্-ইঞ্জিনীয়ার এবং পঁয়ত্রিশ জন পাইলট মারা যান।" এই ঘটনা ঘটে পুণাতে।

দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে বা অন্যত্র এই ১৯৪৪ সালের সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ এরই প্রেরণায় আবার ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীতে) বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৪ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনাকে এমনভাবে চেপে দেওয়া হয়েছিল যে, কোনও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ঘটনা জানা সত্ত্বেও সংবাদ ছাপাতে পারেননি। তবুও 'ফ্রি প্রেস্ জার্নাল্' ছোট করে 'নৌ-বাহিনীতে খাদ্য আন্দোলন' হেডিং

দিয়ে কিছু ছেপেছিলেন সাহস করে। তাও অনেকদিন বাদে। তারিখটা ঠিক মনে করতে পারছি না। তখনকার সময়ে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালোছায়ায় ঢাকা ব্রিটিশ সিংহরাজ তাঁর অর্ধভগ্ন নখদন্ত দিয়ে অতি সন্তর্পণে একদিকে যেমন 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'—এই আত্মম্ভরী অহমিকার প্রবাদবাক্যকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন, অন্যদিকে সোনার ভারতকে চিরদিন মুচড়ে-নিংড়ে লুঠ করার অসীম লালসাকে ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার বাসনায় নিজের এতটুকু দুর্বলতাকেও বাইরে প্রকাশ হতে দিতে নারাজ ছিলেন। তাই, এই বিদ্রোহের অমর ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে অতি কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে মেরে ফেলার পরে গভীর খাদে ফেলে মাটি-চাপা দেবার পাকা ব্যবস্থা করেছিল। (পূর্বেও যেভাবে সে অনেক ঘটনাকে রেখেছিল।) কিন্তু হায়, ইতিহাস যে মরে না, তা বোধহয় সাময়িকভাবে হলেও মদমত্ত ব্রিটিশ-সিংহ ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু 'দেওয়ালের লিখন' আজ বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে।

এদিকে মিঃ এস্. সি. ধর এবং মিঃ মদনলাল সাক্সেনার কোন খবর আর পাওয়া গেল না। তাঁদের মুলতানে আনা হয়নি। কি হলো, কোথায় গেলেন, কিছুই জানতে পারলাম না। তবে শেখ শাহাদত আলী তখনও যে ধরা পড়েননি তা জানতাম। এর পরেও বিভিন্ন স্থান থেকে আরও পাঁচ হাজার বিদ্রোহী সৈনিককে এখানে আনা হয়েছিল।

মুলতান জেলে দিন কাটাচ্ছি। এখানকার দৈনন্দিন জীবন-যাপন আরও ভয়াবহ। তা বর্ণনারও অতীত। মধ্যযুগীয় যে বর্বরতাপূর্ণ অত্যাচারের কাহিনী শোনা যায় এ-যেন তাকেও হার

মানিয়েছে। প্রতিদিন আমাদের ওপরে রুটিন্-মাফিক যে অত্যাচার করা হতো তা নিম্নরূপ ঃ

প্রতিদিন ভোর চারটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতো 'সেল্' (**cell**) থেকে জেল-পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে খোলা মাঠের বধ্যভূমির এক কুঠরীতে। এরকম কুঠরী ওখানে সারিবদ্ধভাবে ২,৪৫০টি আছে। প্রত্যেক কুঠরীতে একজন করে বন্দীকে হাতে-পায়ে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে ওপরে কড়িকাঠের সঙ্গে হ্যাণ্ড্-কাপে শিকল এঁটে ঝুলিয়ে দিতো। পরে সঙ্কর মাছের লেজ (যার গায়ে অসংখ্য কাঁটা থাকে) দিয়ে হুইপ্ করা হতো। পাঠান সৈন্যদের ওপরে আদেশ ছিল প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট হুইপ্ করতে হবে। কেউ যদি ঐ ত্রিশ মিনিট পূর্ণ হবার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়তো, তাহলে তাকে নামিয়ে ইন্জেক্সন দিয়ে চাঙ্গা করে নিয়ে আবার ঐ জহ্লাদেরা ঝুলিয়ে দিত বাকি সময়টুকু পূর্ণ করার জন্যে। কী রকম 'আইন-এর দাস' একবার ভেবে দেখুন ! অবশ্য এটা স্বাভাবিক, কারণ, মিলিটারীতে যে-পরিবেশে সৈন্যদের রাখা হয় (বর্তমানে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে) তাতে সুকুমার-বৃত্তির মানুষগুলোও পশুতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। আমি প্রথম প্রথম অজ্ঞান হয়ে যেতাম। ঐ একই দাওয়াই দিয়ে আমাকে চাঙ্গা করে আবার ঝুলিয়ে বেত মারা হতো। আধঘণ্টা বেত মারার পরে আমাদের নামিয়ে নীচে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হতো। একঘণ্টা পরে তুলে নিয়ে গিয়ে মেথরের কাজ করানো হতো। মেথরের কাজ শেষ হলে হাড়ি-বালতি, বাসন-কোসন ইত্যাদি মাজা-ঘষার কাজে লাগাতো। এ কাজের শেষে রুট্-মার্চে নিয়ে যেতো। একঘণ্টা রুট্-মার্চ করার পরে আমাদের রান্না-বান্নার কাজ দিত। ভালো ভালো খাবার আমাদের দিয়ে তৈরী করানো হতো বটে, কিন্তু তা আবার আমাদের দিয়েই ঐ জেলের মধ্যে অথবা জেলের বাইরে অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের কোয়ার্টারে পৌঁছনো হতো। প্রতিজনের সঙ্গে

থাকতো দু'জন করে রাইফেলধারী গার্ড। যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয়ে কোন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতো, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করে হত্যা করা হতো। কী বীভৎস ব্যাপার! বেলা এগারোটায় আমাদের দেওয়া হতো খেতে। (সে-খাবার তৈরী হতো অন্য জায়গায়।) লুচির সাইজের পাতলা দু'টো আটার রুটি এবং এক মগ জল।

খাওয়া-দাওয়ার আধঘণ্টা পরে আবার রুট্-মার্চে নিয়ে যেতো, চলতো বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত। বিকেল পাঁচটায় আবার খাবার দিত, তা ঐ বেলা এগারোটায় যা দিত তাই। সমস্ত দিনে অন্য কোনপ্রকার জল আমরা পেতাম না। খাবার জল সমস্ত দিনে-রাত্রে ঐ দুই মগ মাত্র। স্নান করতে দেবে না, তা ওখানে নিষিদ্ধ। যে পোশাক পরে জেলে গিয়েছিলাম, তা আর খুলতে দেয়নি। পায়খানা-প্রস্রাবে জল ব্যবহার নিষেধ ছিল। তেল, সাবান ব্যবহার বা দাঁড়ি কামানো তো ছিল কল্পনা-বিলাস।

"পাপ-দানবীর অত্যাচারে ডাকছে যে নর ত্রাহি ত্রাহি,
চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি।"

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই ছিল রুটিন্। চিন্তা করে দেখুন, কী অমানুষিক নির্যাতন! বিংশশতাব্দীতে এই বর্বর অত্যাচার, চিন্তারও অতীত। কিন্তু আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, এও ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে মুলতান মিলিটারী জেলের একটা বর্ণনা দেওয়া সঙ্গত মনে করে এই অনুচ্ছেদে তা জুড়ে দিলাম। সমস্ত জেলটি অনুমান প্রায় তিন মাইল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট-বড় পাহাড়ের টিলাও আছে। মাঝখানে একটি চারতলা গম্বুজ। তাকে সেণ্ট্রাল টাওয়ার বা গুমটি বলা হতো। সেই গুমটিকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে যদি একটা বৃত্ত বা মণ্ডল আঁকা যায়, তাহলে সেটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বলা

যেতে পারে। প্রাচীরগুলো সুউচ্চ। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, উচ্চতায় কমপক্ষে পঁচিশ হাত। কেন্দ্রস্থ গম্বুজ থেকে দশটি ঋজুরেখা বা ব্যাসার্ধ দশদিকে গিয়ে মণ্ডলটিকে ছুঁয়ে আছে। এই দশটি রেখাই দশটি মহল বা ব্লক। এরই নাম মুলতান জেল। গম্বুজটি যেমন চারতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলও চারতলা। প্রত্যেক তলায় এক লাইনে ২৪০টি কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরিতে একটি করে লোহার গরাদ আঁটা দরজা আছে। কপাট বা বন্ধ door leaf নেই। পেছনে সাড়ে চার হাত উঁচুতে যে ছোট জানালাটি আছে তাও দু' ইঞ্চি ফাঁকা ফাঁকা গরাদে আঁটা। ঘরে আসবাবের মধ্যে একহাত চওড়া তিনখানা নারকেল দড়ির খাটিয়া, আর ঘরের কোণে একটি আলকাতরা-মাখা মাটির ভাঁড়। প্রত্যেক কুঠরিতে তিনজনের বেশি লোক ধরে না। কিন্তু আমাদের কোন কোন সময় পাঁচজন থেকে সাতজন করে রাখা হতো। প্রত্যেককে খাটিয়া দেওয়া হতো না বা আলাদা আলাদা ভাঁড় দিত না। ঐ ভাঁড় দেওয়া হতো যদি রাত্রিতে কেউ পায়খানায় যায়, তার জন্যে। যে নারকেল দড়ির খাটিয়ার কথা বলা হলো তাতে ঘুম হতো খুব সজাগ থেকে। কারণ একটু অসাবধানে পাশ ফিরলেই ধপ্ করে মাথা ঠুকে গিয়ে ভূমিশয্যা নিতে হবে।

কুঠরিগুলো এক সারে। তাদের সামনে দিয়ে তিন-চার হাত চওড়া বারান্দা চলে গিয়েছে। বারান্দাটি গরাদে ঘেরা। তার মাঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা। এ দরজা খুলবার নয়, খিলানে আঁটা। সব দালানগুলির মুখ গুমটিতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এখানে লাইনে বা corridor-এ প্রবেশ করবার ফটক। রাত্রে এ ফটক বন্ধ হয়ে যায়। কুঠরিগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায়। তালা দেবার স্থান বাইরে দেওয়ালের গায়ে, ভেতর থেকে তালা বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না।

রাত্রিতে প্রতি লাইনে কুড়িজন করে ওয়ার্ডার (তারাও সৈন্য) থাকে। এরা প্রহরী। প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর টর্চ হাতে চারজন করে লাইনের এ মোড় থেকে ও মোড়ে ঘুরতে থাকে এবং কুঠরির মানুষ-পশুগুলি কি করছে তা দেখে যায়। সমস্ত জেলের দশটি ব্লকের চল্লিশটি লাইনে একসঙ্গে আটশ' ওয়ার্ডার বা সান্ত্রী এমনি ঘুরে ঘুরে নিজের পালা শেষ হলে অন্যকে জাগিয়ে দেয়। এইভাবে পালাক্রমে আটশ' সান্ত্রী মিলে জেলে এই দুঃসাধ্য সাধনে নিশি ভোর করে। গুমটিতে চারজন সিপাহী টর্চ হাতে উপগ্রহের মত অবিশ্রান্ত ওপর-নীচে ঘুরতে থাকে। তারা এক এক ব্লকের কাছে আসে আর সেই লাইনের ওয়ার্ডার হাঁক দিয়ে রিপোর্ট দেয়, "তিন তালা বন্ধ, চার ওয়ার্ডার, সব ঠিক হ্যায়।" এই পুলিশে ও লাইনের ওয়ার্ডারে ভক্ষ-ভক্ষকের সম্বন্ধ। কারণ, ওয়ার্ডার কখনও দৈবাৎ বসে পড়লে বা টর্চ মাটিতে রাখলে সান্ত্রী (মিলিটারী পুলিশ) রিপোর্ট বা নালিশ করলে শস্তি ভোগ করতে হয়।

বিদ্রোহী বন্দী-কয়েদীদলকে নিয়ে জেলের গেট পার করিয়ে বাগানের কাছে সার দিয়ে দাঁড় করানো হলো। এটাই ওখানকার নিয়ম। জেলার সাহেব প্রথমেই একবার কয়েদীদের দেখে রাখেন। অবশ্য এই প্রথম আর এই শেষ। তেরো মাসের মধ্যে আমি আর তাঁকে দেখতে পাইনি। নতুন কয়েদীরাই ভাগ্যবান। কেবলমাত্র তাদেরই তিনি দেখা দেন। মিঃ হেনরী (জেলার সাহেব) এখানে কয়েদীদের সামনে আবির্ভূত হলেন। এসেই এক লম্বা বক্তৃতা আরম্ভ করলেন,—"এই পাঁচিল দেখছো, এ খুব উঁচু। কিন্তু এও অনেকে ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে তার মৃত্যু ঘটে। কখনও মনে করো না—এখান থেকে পালানো অত সোজা। চারদিকে অনেক মাইল পর্যন্ত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত। আর আছে এই পাঁচিলেরই গায়ে বাইরের দিকে বড় বড় খাদ। বনে-জঙ্গলে

বাঘ-ভাল্লুক তো আছেই। মানুষ দেখলেই খেয়ে নেবে। আর আমাকে দেখতে পাচ্ছো তো ? আমার নাম ডি. হেনরী। ভালো মানুষের কাছে আমি খুবই ভালো, লোকের ভালো করতেই আমি চাই ; কিন্তু বাঁকার কাছে আমি চারগুণ বাঁকা। যদি আমার অবাধ্য হও তাহলে ভগবান তোমাদের সহায় হতে পারেন, কিন্তু আমি যে হব না, সেটা স্থির জেনে রেখো। আর একটা কথা জেনে রাখো যে, এই মুলতান জেলের চার মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না।"

এই জেলের চৌহদ্দির মধ্যে নির্যাতনে দীর্ঘ তেরো মাস কাটাবার পরে ১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু বাঁচার কোন আশাই ছিল না। বাঁচার আশা আর নেই জেনেই তো ওরা আমাকে ছেড়ে দিল, আমার জামার বুকপকেটে একটা 'ওয়ারেন্ট্' পাশ দিয়ে। ডেস্টিনেশন্ হাওড়া স্টেশন। কোন্ ট্রেনে তুলে দিল তাও আমার জানবার অবস্থা ছিল না। দীর্ঘ তেরো মাস ঐ অবস্থায় থেকে আমি একরকম অথর্ব, জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। কোন কিছুই চিনতাম না, কোন কিছুই বুঝতাম না। কেউ কাছে এলে তাকেও চিনতে পারতাম না। কেউ ডাকলে, তার স্বর আমার কানে ঢুকতো না। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় কত লোক যে ওখানে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসাব রাখা দুঃসাধ্য। যে-কেউ মারা গেলে তাকে উঁচু পাঁচিলের বাইরে খাদের মধ্যে ফেলে দিত। আর ঐ মৃতদেহগুলো শিয়াল-কুকুর-শকুনে খেয়ে নিত, অথবা পচে গলে মাটি হয়ে যেতো। আমার অনুমান, তিন হাজারের ওপর ভারতীয় সৈন্য ঐ সময়ে মারা গিয়েছিল। অবশ্য আমার যে-পর্যন্ত জ্ঞান ছিল সেই পর্যন্ত বলতে পারি। তার পরের কথা বলা মুস্কিল।

"মৃত্যু-শ্মশান মাঝেতে আজি রে,
কে যেন স্বরগ-গীতি গায় ;

মুছে গেছে তাই ভীষণ-কালিমা,
দীপ্ত হইল বিশ্বময়।”

আমার হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছনোর পরের ঘটনা আরও অদ্ভুত। তার পূর্বে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, মুলতান জেলে বর্বর অত্যাচারের ফলে যে-হারে লোক মরতে থাকে, তার কিছু কিছু খবর ঐ উঁচু পাঁচিলের বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কোন খবরের কাগজে বিশেষ করে মাস্থলী ‘লেবর’-এ এবং ফ্রি প্রেস জার্নাল্-এ তা ছাপ হয়। ফলে, দেশে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তখন চাপে পড়ে মিলিটারী কর্তৃপক্ষ ঠিক করলো যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তাঁরা ভাবলেন, এখানে তো মারা যেতোই, তা এখানে না মরে বাড়ি গিয়ে মরুক। তাঁরা এও ভাবলেন. অনেকে হয়তো পথেই মারা যাবে, বাড়ি পর্যন্ত যাবার সুযোগটুকুও পাবে না। তাই, ঐ অবস্থায় যে লট্ ছেড়ে দেওয়া হলো, আমিও ঐ লটের মধ্যে পড়ে গেলাম। জানি না, ভাগ্য কোথায় নিয়ে যাবে! ভগবানের অশেষ করুণায় আমি এখনও বেঁচে আছি। তবে বেঁচে আছি অর্ধাহার-অনাহারজনিত হৃদ্‌রোগের রুগী হিসাবে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছলে সবাই নেমে গেল। ট্রেন তখন খালি। সৌভাগ্যবশত স্টেশনে সেদিন মেজদা হাজির। মৃত-প্রায় অবস্থায় বাড়ি পৌঁছলাম। হ্যাঁ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন আসার পরে সেই অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ এবারে দিচ্ছি। ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে থামার পরে যখন সবাই নেমে গেল এবং ট্রেন যখন খালি হলো, তখন সুইপাররা ট্রেন পরিষ্কার করতে লেগে গেল। ট্রেন পরিষ্কার করতে করতে একটা কামরায় তারা দেখতে পেলো (অবশ্য এসব ঘটনা আমি ভালো হবার পরে শুনেছি। এইসব সুইপাররা আমাকে পরে দেখতেও এসেছিল—তাদের মুখেও শুনেছি।) একটা মিলিটারী কামরায় এক অর্ধমৃত রুগ্ন মিলিটারির ময়লা পোশাক-

পরা লোক পড়ে আছে। তখন ওরা তিন-চারজন মিলে আমাকে ধরাধরি করে হাওড়া স্টেশনের বাইরে মেইন্ গেটের পাশে নিয়ে এসে একটা বড় পিলারের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসিয়ে রাখলো। ওদের ধারণা ছিল, আমার কোন আত্মীয়স্বজন হয়তো আসবে, তারাই নিয়ে যাবে। আর যদি কেউ না আসে তাহলে আমাকে মিলিটারী হাসপাতালে পাঠাবে। যা কিছু হবার সেখানেই হবে। ওরা নাকি বলাবলি করছিল, 'ওরে, মরেনি, প্রাণ এখনও আছে।' কিন্তু কী আশ্চর্যভাবে যোগাযোগ ঘটলো, ভগবানের কি অসীম অনুগ্রহ, এই ঘটনার আধঘন্টা পরে শ্রীরামপুরের একটা লোকাল ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে থামলো। এই ট্রেনে আমার আপন মেজদা শ্রীযুত হরিপদ ভট্টাচার্য শ্রীরামপুরের শিষ্যবাড়ি থেকে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি মেইন্ গেট দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে বাসে ওঠার জন্যে ছুটছিলেন।

বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে অযাচিতভাবে আমার দিকে একটা গ্ল্যান্স্ দৃষ্টি ফেলেছিলেন মাত্র। প্রথমে কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। কেননা তাঁরা সবাই যখন লোকমুখে শুনেছিলেন যে, নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে তখন তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, আমাকে নিশ্চয়ই গুলী করে মেরে ফেলা হয়েছে। অতএব আমার বিষয়ে চিন্তা করা অবান্তর। বিশেষতঃ আমি তো মৃত্যু জেনেই ওপথে পা দিয়েছিলাম। কিন্তু, কি যেন আবার তাঁর মনে উঁকি দিয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, যাই, দেখি আবার। মিলিটারী লোকটাকে গিয়ে একটু দেখি। মানুষ-প্রকৃতির এই বোধহয় নিয়ম। বিশেষভাবে সমগোত্রীয় যখন কেউ থাকে তার নিকট-আত্মীয়। এখানে মেজদার এক ভাই, অর্থাৎ, আত্মীয় মিলিটারির কর্মচারী। তাই বোধহয় এই মিলিটারী লোকটাকে মুমূর্ষু অবস্থায় একটি বার দেখে তাঁর হৃদয়ে সমগোত্রীয় ভাবাদর্শে সমবেদনার সঞ্চার হয়েছিল। এখানেই মানুষের সুকুমার-বৃত্তিনিচয়ের পরিচয় মেলে। তিনি আবার ভাবলেন, তবে আমাদের 'ফণী' নয় নিশ্চয়ই! কী আর

বলব ! মেজদা আবার ফিরে এলেন এবং আমাকে নাকি তীক্ষ্ণ-ভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পেরে আমার মুখের ওপরে মুখ রেখে জোরে বলে উঠলেন, 'ওরে, তুই ফণী না ?' আমি নাকি কোন কথা বলতে পারিনি। শুধু একটা ক্ষীণ আওয়াজ (thin sound) আমার কানে লেগেছিল। তাতে নাকি আমি শুধু দু'টো চোখ একটু মেলেছিলাম, তার পরের ঘটনা আর কিছুই জানি না। তারপরে জানতে পারলাম, মেজদা আর কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সী ডেকে আমাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে সোজা বাসায় নিয়ে এলেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে আমার চিকিৎসা করান। ফলে, ভগবানের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেলাম এবং একটু মনুষ্যাকৃতি লাভ করলাম। কিন্তু আমার পূর্ব-স্বাস্থ্য আর ফিরে পেলাম না। তবু অন্তরে আছে—"শ্রুতির চুম্‌কি ঝক্‌মকে ওই, চলনে চম্‌কে ওঁ তৎসৎ।"

ভারতের নৌ-বিদ্রোহের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনীতে) কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে যে-সমস্ত দেশপ্রেমিক তরুণ (যাদের বয়স ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে) প্রবেশ করেছিলেন সশস্ত্রবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দীর্ঘদিনের কলঙ্কিত শৃঙ্খলিত ভারতমাতাকে মুক্ত করার মানসে, তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের একনিষ্ঠ কর্মী। তবে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীসংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। এর পরের স্থানই হলো কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের। দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তখনও পূর্ণ হলো না। তাঁরা আশা পোষণ করতে লাগলেন,—

"আনো নূতন প্রভাত, আনো নূতন জীবন ;
ভারতে ফিরিয়ে আনো নব বৃন্দাবন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

**"One step forward,
Two steps back."**

মহান লেনিনের মহান নির্দেশ কার্য-পরম্পরায় আমাদের ওপরেও বর্তালো। আমরা আপাততঃ আন্দোলনের যে পর্যায়ে এসে গিয়েছিলাম সেখান থেকে যাতে পিছিয়ে না পড়ি, যে স্তরে এসে পা রেখেছি সেখানে যাতে দু'টো পা-ই শক্ত করে রাখতে পারি, এবং ভবিষ্যতে আবার যাতে শক্ত আঘাত হানা যায় পায়ের তলার মাটিকে দৃঢ় রেখে, তার জন্যে দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর পরিস্থিতি ভালোভাবে নিরীক্ষণ ও গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চলতে লাগলাম। আমি যদিও তখন পর্যন্ত অসুস্থই ছিলাম। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় থেকেও দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সর্বরকম অবস্থার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চলা স্তব্ধ হলো না। চলতে থাকলো জ্ঞান-সাধনা। কারণ, ভারতে 'নতুন প্রভাত' আনবে যে-নবজাতক তাকে তো নবজন্ম লাভ করাতে হবে। তারই কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকলো দিকে দিকে। আপাততঃ সংগ্রামের হাতিয়ার ঘরে তুলে রাখা হলো জ্ঞান-চর্চার নিমিত্ত।

লর্ড ওয়াভেল্ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের সহিত পরামর্শের জন্য লণ্ডন যান। তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের (১৯৪৫ সালের ৪ঠা জুন) কয়েকদিন পরে ভারত-সচিব মিঃ অ্যামেরী (**Mr. Amery**) কমন্স্ সভায় একটি বিবৃতি দেন (১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন)। বিবৃতিতে বলা হয়, "১৯৪২ সালের মার্চ মাসের প্রস্তাব কোনরূপ পরিবর্তন বা সর্তসাপেক্ষ না রেখে পুরাপুরি বহাল

থাকলো।” নতুন সংবিধান রচনার আগে গভর্ণর জেনারেলের শাসন-পরিষদকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব করা হলো। গভর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত (প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-সচিবের পদে বহাল থাকবেন) শাসন-পরিষদের অন্য সদস্যগণ ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। শাসন-পরিষদের সদস্য মনোনয়নে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের সমভার প্রতিনিধিত্ব (Balanced Representation) থাকবে, এর মধ্যে মুসলমান ও বর্ণ হিন্দুদের আনুপাতিক হার হবে সমান সমান। বৈদেশিক ব্যাপারের দপ্তর গভর্ণর জেনারেলের হাত থেকে শাসন-পরিষদের একজন ভারতীয় সদস্যের হাতে দেওয়া হবে। (তবে ভারতের প্রতিরক্ষার অংশ হিসাবে উপজাতীয় ও সীমান্ত সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।) বিবৃতিতে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হলো যে, কেন্দ্রের সহযোগিতার ছাপ প্রদেশ-গুলিতেও পড়বে এবং যে সমস্ত প্রদেশে ৯৩ ধারায় (১৯৩৫ সালের আইনের) শাসন চলছে সেখানে প্রধান দলগুলির সহযোগিতার (qualition) ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তিদান করা হলো ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুন এবং এই সালের জুন-জুলাই মাসে সিমলায় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। শাসন-পরিষদের গঠন সম্পর্কে সম্মেলনে কোনও মতৈক্য হলো না। কংগ্রেস দু'জন কংগ্রেসী মুসলমানকে শাসন-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তুললো, জাতীয় সংগঠন হিসাবে শুধুমাত্র হিন্দুদের মনোনয়নের অধিকার গ্রহণ করতে কংগ্রেস স্বীকৃত হলো না। মিঃ জিন্না দাবী করলেন যে, পরিষদের সমস্ত মুসলিম্ লীগই নির্বাচন করবে। লর্ড ওয়াভেল্ ঘোষণা করলেন, সম্মেলন ব্যর্থকাম হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বললেন, দেশের প্রগতিকে রুদ্ধ করতে মুসলিম্ লীগকে বড়লাটই সাহায্য করছেন।

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর, ব্রিটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এবং যুদ্ধে পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক জটিলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির ধারার পরিবর্তন সূচিত হলো। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের কয়েকজন সেনানীর বিচারে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই বীর যোদ্ধাদের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। স্থির হলো ১৯৪৫-৪৬ সালে শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল্ ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচন-পর্ব শেষ হলে একটি সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নিয়োগ করা হবে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে বড়লাটের শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত হবে।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে, সমস্ত প্রদেশেই অ-মুসলমান আসনগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেশির ভাগ মুসলমান আসন ও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসামের কতকগুলি মুসলমান আসন কংগ্রেস লাভ করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশের বহু মুসলমান আসন মুসলিম্ লীগ পেল। বঙ্গদেশ ও সিন্ধুদেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করলো। সর্বত্রই নিখাদ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হলো, কেবল পাঞ্জাবে কংগ্রেস, আকালী শিখ, ইউনিয়নিস্ট হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হলো যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪৫ সালের শীতকালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক প্রতিনিধিদল ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতালাভের জন্য এদেশে আসেন, ফলে দেশে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হলো। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার উদগ্র বাসনার অভিব্যক্তি ফেটে পড়তে চাইলো। এই তরঙ্গের ধাক্কা দেশী-বিদেশী সরকারী-বেসরকারী সমস্ত সংগঠনের গায়েও লাগলো ; সর্বত্রই

যেন মৃত-সঞ্জিবনী সুধা পান করলো সবাই। সেই আলোড়নের ঢেউ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ওপরেও এসে পড়লো। আবার শোনা গেল সাজ-সাজ রব। বলা বাহুল্য আমি যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠি, তখন ঐ সেনাবাহিনীতে আন্দোলন শেষ হয়নি ভেবে আবার গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করি এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাইরে থেকে ভেতরে আন্দোলন করবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকি।

এবারে যোগসূত্র পেয়ে গেলাম বোম্বাইয়ের শ্রীযুত আর. এস্. রুইকরের মাধ্যমে। শ্রীযুত রুইকর বোম্বাইয়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের গোপন আড্ডায় আমাকে বসিয়ে দিলেন কেবলমাত্র নৌ-বাহিনীতে সংগঠিত আন্দোলন পরিচালনা করার জন্যে। কেননা, তিনি জানতেন মুলতান মিলিটারী জেলে নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে আমার শরীর একরকম ভেঙে গেছে। এই স্বাস্থ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদস্য থেকে পূর্বের মত কঠোর পরিশ্রম (শারীরিক এবং মানসিক) করা সম্ভব নয়। তাই আমাকে কেবলমাত্র নৌ-বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হলো, যাতে ভালোভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা যায়। বিশেষতঃ নৌ-বাহিনীতে একবার যখন আমি আন্দোলন পরিচালনা করেছি ; অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি প্রচুর। তখন থেকে আমার ছদ্মনাম রাখা হলো মিঃ পি. আপ্তে (**Mr. P. Aptey**)।

নভেম্বর বিদায় নিচ্ছে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর আসি-আসি করে এখনও আসছে না। এদিকে জাপান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। তার কয়েক দিন বাদে রহস্যময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর জীবনের অবসান ঘটলো (২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫)। মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো এবং ভারত সরকারের পতন

ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ব্রিটিশ কমাণ্ডার-ইন্-চীফ মিঃ অচিনলেক্ চেয়েছিলেন আই. এন.-এর লোকদের বিচারের নামে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝোলাতে। ওদিকে যুদ্ধ চলাকালীন যে সমস্ত বন্ধুরা (সৈনিক-বন্ধুরা, বিশেষ করে নৌ-বাহিনীর সৈন্যরা) পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল, যুদ্ধের শেষে নৌ-বাহিনীর 'তলোয়ার' জাহাজে এসে হাজির হতে লাগলো সবাই। একদিন নৌ-ঘাঁটির বাইরে ফরওয়ার্ড ব্লকের গোপন আড্ডায় (বোম্বাইয়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের গোপন কেন্দ্রে) শ্রীযুত এস্. এম্. শ্যাম, যিনি মালয় থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন, আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর বিচিত্র কাহিনী বললেন। মালয় দখলকারী আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর সৈন্যদের সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। তিনি প্রাক্তন আজাদ্ হিন্দ্ সরকারের কোন কোন সভ্যের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন। সেই চিঠিগুলো ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজীর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর নিকট লেখা। তিনি কিছু কাগজপত্র এবং আলোকচিত্রও সঙ্গে এনেছিলেন। ঐ সমস্ত কাগজপত্র, চিঠি এবং আলোকচিত্র যথাস্থানে গোপন সংস্থার মাধ্যমে পৌঁছনো হলো।

এবারে নৌ-বাহিনীর ভেতরে অবস্থানরত দু'জন যোগ্য কর্মীকে ঠিক করা হলো যাঁরা নৌ-বাহিনীর বাইরে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা সমিতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলবেন। (পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেক বড় বড় সহরে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা সমিতি আছে। যদিও কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার কোন কোন সদস্য ১৯৪৪ সালের আন্দোলনে ধরা পড়ে জেলে গেছেন; কিন্তু তাতে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ভেঙে যায়নি বরং কয়েকজন নতুন সদস্য তাতে যুক্ত হয়েছেন।) তাঁরা হলেন শ্রীযুত এস্. এম্. শ্যাম এবং শ্রীযুত বি. সি. দত্ত। (শ্রীযুত বলাই চন্দ্র দত্ত—আর. আই. এন.-এর B-21 Beach Signal Unit-এর বেতার-কর্মী। যুদ্ধের পরে এই ইউনিট্ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।) 'তলোয়ার' জাহাজে আজাদ্

হিন্দ্ ফৌজের আসন্ন বিচারের সংবাদে নৌ-সেনারা বা রেটিংরা বিচলিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলো, ব্যারাকগুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থার চাপে পরিস্থিতি হয়ে উঠলো আরো বেশি সঙ্কটাপন্ন। যুদ্ধ শেষে সামরিক কর্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়া সৈন্যদের পুনঃ কর্ম-সংস্থাপনের বিষয়টির প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অবহেলা দেখা গেল। অতর্কিতে রেটিংদের বেকার হওয়ায় নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হলো।

'তলোয়ার' জাহাজে আবার সেই খাবারের নিকৃষ্টতা নিয়ে গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে। পূর্বে তাদের বন্ধুদের ওপরে কঠোর নির্যাতনের কথা তারা ভুলে যায়নি। তাই আবার আরম্ভ হলো সেই কর্মসূচী যা ১৯৪৪ সালের আন্দোলনে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের আন্দোলন তো ছাপ রেখে গেছে। চতুর্দিকে একটা ভাঙাগড়ার অবস্থা চলছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অবশ্য পুরোপুরি নয়। পুরোপুরি যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। রেটিংদের মধ্য থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে, আরও অনেকে ছাঁটাই-এর সম্মুখীন— তারা নোটিশও পেয়ে গেছে। শুরু হলো ছাঁটাই। অথচ বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এখন সবাই বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থার আবেদন নিয়ে ফ্লাগ্ অফিসারের সামনে আবেদন রাখতে শুরু করেছে। পূর্বে যে কঠোর শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল তা যেন এখন অনেকটা ঢিলা হয়ে গেছে।

পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতিও ব্রিটিশকে অনেকটা পঙ্গু করে ফেলেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সর্বত্র অসন্তোষ, বিক্ষোভ যেন আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। এই অবস্থার মধ্যে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর 'নৌ-দিবস' পালন করা হবে। এবারে এই সর্বপ্রথম নৌ-দিবসে দেশের অসামরিক জনগণকে আমন্ত্রণ জানানো হলো আরব সাগরের তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো (নৌ-বাহিনীর) এবং সুসজ্জিত জাহাজগুলো দেখার জন্যে। কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান দ্বারা গঠিত এক নাবিকগোষ্ঠী, পতাকা এবং অন্যান্য উপাদানে সুসজ্জিত

ফিটফাট্ জাহাজ-সমষ্টি দেখাতে। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও কঠোরভাবে রক্ষা করার প্রতি নজর রাখা হলো। কিন্তু রেটিংরাও চুপ করে বসে নেই। তারাও গোপনে, অতিসন্তর্পণে এই যোগাযোগের সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে থাকলো। তারা মনে করলো, অসামরিক জনগণকে দেখাতে হবে যে, তারাও দেশের জনগণের সাথে একত্র হয়ে ব্রিটিশকে তাড়াতে বদ্ধ-পরিকর। তাই তারা পূর্বদিন সমস্ত রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে সেই সজ্জিত প্রদর্শনীকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো।

ভোরবেলায় দেখা গেল 'তলোয়ার'-এর এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত পোড়া পতাকা এবং পতাকার পোড়ানো কাপড়ে প্যারেড-গ্রাউণ্ড জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। এমন কি ঝাঁটাগুলো ও বাল্‌তিগুলো পর্যন্ত রাখা হয়েছে একেবারে সামনে—প্রবেশের পথে। প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে রাজনৈতিক শ্লোগান্ লিখে রাখা হলো, "ভারত ছাড়ো", "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্", "এখনই বিদ্রোহ করো", "গোরাদের হত্যা করো", ইত্যাদি—সেই পূর্বের শ্লোগান্।

কর্তৃপক্ষ ভোরবেলায় ঐসব দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি জায়গাটা পরিষ্কার করতে। ফলে রেটিংরা হলো উত্তেজিত। ঠিক এই সময়ই মিঃ আর. কে. সিং (একজন নৌ-সেনা) তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন নৌ-কর্তৃপক্ষের কাছে। খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ-রাজকে অগ্রাহ্য করার মনোভাব। আমাদের মতো গুড়-গুড়-ঢাক্-ঢাক্ নীতির বা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের ওপরে তিনি আস্থাশীল নন। এইভাবে আর. আই. এন্. থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন রেটিংদের বিদ্রোহে সাহায্য করতে। তিনি একটু ভাবপ্রবণ ছিলেন ; কিন্তু তাঁর বিশিষ্টতা স্বীকার করতেই হবে। এই সব ঘটনায় 'নৌ-দিবস' উৎসব এবং তার উদ্দেশ্য পণ্ড হলো। নিমন্ত্রিত জনগণকে কর্তৃপক্ষ মাইক্রোফোনে বলতে থাকেন, "আজ নৌ-দিবস উৎসব অনিবার্য কারণবশত স্থগিত

রাখা হলো। পরবর্তী কোন সময়ে আবার উৎসবের দিন ঘোষণা করা হবে।”

অবশ্য আসল কারণ জনগণ কিছু সময়ের মধ্যেই জানতে পেরেছিলেন। এদিকে যখন মিঃ সিংকে কমাণ্ডিং অফিসারের সামনে আনা হলো, তখন মিঃ সিং তাঁর মাথার টুপী খুলে ছুঁড়ে মারলেন মাটিতে। তারপর পা দিয়ে লাথি মেরে থেঁতলে দিলেন। প্রকাশ করলেন রাজমুকুট এবং রাজার সৈনিকের প্রতি তাঁর প্রকৃতই ঘৃণা ও অবজ্ঞা। ফলে, অন্যান্য রেটিংরা তা দেখে গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্রিটিশ অফিসাররা হলেন উত্তেজিত। তাঁরা মিঃ সিংকে তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। রেটিংদের কাছে মিঃ সিং একজন ‘বীর শহীদ’ নামে খ্যাত হলেন। তখন অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলো।

দিন দিন রেটিংদের সাহস বেড়ে যেতে লাগলো। ছোটখাটো আরও অনেক ঘটনা ঘটতে থাকলো। ওদিকে কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বেশি জোরদার করলো। রেটিংদের মধ্যে যাদের ওপরে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ছিল, এবারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ছাঁটাই করতে আরম্ভ করলো। ফলে ক্রমে ক্রমে নৌ-সেনারা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। ঠিক এই সময়ই জানাজানি হয়ে পড়লো যে, নেতাজীর আই. এন. এ. বাহিনীর সৈন্যদের বন্দী করে দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের জন্যে আনা হয়েছে। তার কারণ, তাঁরা নেতাজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশের এবং তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। অতএব তাঁদের শাস্তি দিতে হবে। বিচার তো প্রহসন মাত্র। আর যায় কোথায়! ঘা-এর ওপরে নুনের ছিটের মতো। তার কিছুটা প্রকাশ পেল ১৯৪৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে,

যখন কমাণ্ডার-ইন্-চীফ মিঃ অচিনলেক্ সর্বপ্রথম 'তলোয়ার' পরিদর্শন করতে আসবেন—এই খবর প্রচার হওয়ার পরের ঘটনায়। রেটিংরা ঠিক করলো, নৌ-দিবস উপলক্ষে যেভাবে বিদ্রোহ সংগঠিত করা হয়েছিল, তার চেয়ে আরও ভালো কাজ করতে হবে।

এদিকে কর্তৃপক্ষও চুপ করে বসে নেই। কোনও প্রকার অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্যে সর্বপ্রকার পাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই সতর্কতার মধ্যেও মিঃ বি. সি. দত্ত এবং আরও কয়েকজন সাথী মিলে যে-বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে কমাণ্ডার-ইন্-চিফ অভিবাদন গ্রহণ করবেন, সেই বেদীর গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখলেন, "জয়হিন্দ", "ভারত ছাড়ো"—এই শ্লোগান্ দু'টো। আর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। একে তো কড়া গার্ডের ব্যবস্থা ছিল, তার ওপরে অর্ডার ছিল বেদীর কাছে কাউকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলী করে মারা। তবে একটা প্রবাদ-বাক্য আছে—যত যেখানে কড়া তত সেখানে ঢিলা।

এখানেও তাই ঘটলো। যে-নিরাপত্তা বাহিনী ছিল কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্ত, সেই নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেই ছিল আমাদের সক্রিয় কর্মী—ঐ সরষের মধ্যেই ছিল ভূত। তাই ঐ কঠোরতার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব করা হলো। রাতের পাহারা তীব্রতর থাকায় আমাদের কর্মীরা বেশিদূর অগ্রসর হতে না পেরে ঐ দু'টো শ্লোগান্ ছাড়া ব্যারাকের দেয়ালে আরও কিছু শ্লোগান্ লিখে এবং কিছু রাজদ্রোহী প্রচারপত্র সেঁটে দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলেন। ভোরবেলায় প্রহরীরা এসে আবিষ্কার করলো সেইগুলো। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্যারাকগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে সার্চ করার আদেশ দেওয়া হলো।

অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ পরিচালনা করতে গিয়ে মিঃ দত্ত রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন ; ফলে তিনি ছিলেন ক্লান্ত, অবসন্ন। যে-সময়ে তাঁর কাজ শেষ হয়েছিল তখন সবে ভোর হয়েছে।

সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে। তাঁর পক্ষে সব জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলা বা হাত সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলে পাহারাদারদের সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলো না। তিনি এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, অসাবধানতাবশত একাধিক সূত্র পেছনে ফেলে এসেছেন। ফলে, সেই পেছনে ফেলে-আসা সূত্র ধরে অতি সত্বর গুপ্তসন্ধানী রক্ষীবাহিনী তাঁর সন্ধান পেয়ে গেল। মিঃ দত্তের ঘর সার্চ করে সমাজতান্ত্রিক নেতা অশোক মেটার লিখিত "ভারতীয় বিদ্রোহ—১৮৫৭" এক কপি বই, কতকগুলো দোষারোপ করা কাগজপত্র এবং তাঁর নিজের (মিঃ দত্তের) ডায়েরী পেয়ে গেল। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।

ঠিক ঐ একই সময়ে মিঃ এস্. এম্. শ্যামকেও গ্রেপ্তার করা হলো। গোপন সংস্থার যোগাযোগকারী দু'জন কর্মীই ধরা পড়ে গেলেন। মনে হয়, উন্মাদনার আতিশয্যে তাঁরা আত্মপ্রসাদের মাত্রা পূর্বাহ্ণেই একটু বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা যে গোপন সংস্থার যোগাযোগকারী কর্মী তা সাময়িকভাবে হলেও ভুলে গিয়েছিলেন। নতুন করে আবার লোক খুঁজতে হচ্ছে।

ঐ সময়ে আরও অনেক সক্রিয় কর্মী ধরা পড়ে বন্দীশিবিরে গেলেন। গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে ভেতরের অন্য আর একজনকে ঠিক করা হলো। তিনি হলেন শ্রী বি কে. ভট্টাচার্য (শ্রীযুত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য,—এইচ. এফ. এস্. উলফ্ শিপ-এর গার্নার, নম্বর ১৮৮৩১)। নৌ-বাহিনীর ভেতরে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

২রা ফেব্রুয়ারির অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের সংবাদ বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হয়েছিল। ফলে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ সেখানে এলেন ছ'ঘণ্টা পরে। এই ঘটনায় রেটিংদের মধ্যে এবং অন্যান্য জাহাজগুলিতে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। গোপন কার্যাদি পুরাদমে চলতে থাকলো। কমাণ্ডার কিং হয়ে পড়লেন অধৈর্য।

এদিকে মিঃ বি. সি. দত্তকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কমাণ্ডিং অফিসারের অফিসে। 'তলোয়ার'-এর সমস্ত অফিসারই সমবেত হয়েছিলেন সেখানে। অনেক কিছুই শ্রীযুত দত্তের কপালে আছে,—এই ভাবখানা দেখিয়ে মিঃ কিং (সি. ও.) বললেন, "তা হলে তুমিই!" ওরা সবাই ধরে নিয়েছিল, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে শ্রীদত্ত মিথ্যার আশ্রয় নেবেন। কিন্তু তা না করে শ্রীদত্ত তাঁর সঙ্কল্পে অবিচলিত থেকে গেলেন। মিঃ কিং গর্জে উঠে বললেন, "তোমার কার্যকলাপের পরিণতি কি, তা জানো?" শ্রীদত্ত সদম্ভে উত্তর দিলেন, "শান্ত থাকো,—তোমার গোলাবর্ষণকারী দলের সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত।"

শ্রীদত্তের কল্পনায় স্বাধীন ভারতের একজন সৈনিকের পক্ষে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যতটা নির্ভীকভাবে বলা সম্ভব ততটা নির্ভীকভাবেই তিনি ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। নিয়মকে নস্যাৎ করে শান্তভাবে তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের সামনেই বসে পড়লেন। পরিস্থিতিটা চলে গেল অ্যাডমিরেল্‌টির নিয়ম ধারার বাইরে। এটা ছিল একান্তই কল্পনাতীত। দৃশ্যতঃ প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি এবং চূড়ান্ত অপমানিত হলো। অফিসাররা বুঝতে পারলেন না এরপর কোন্ ভূমিকা তাঁরা গ্রহণ করবেন। আর. আই. এন.-এর মধ্যে নিজ হাতে একটি শহীদ তৈরী করার মতো সাহস মিঃ কিং-এর ছিল না। তাই তিনি স্থির করলেন, ব্যাপারটা উচ্চতর নৌ-কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন। তাই শ্রীদত্তকে আবার বন্দীশিবিরের 'সেল' (cell)-এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল তখন ঘোরালো।

পরের দিন শ্রীদত্তের গ্রেপ্তারের খবর বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় প্রকাশ পেল। কমাণ্ডিং অফিসারের সম্মুখে তাঁর বীরত্বের কাহিনীর অতিরঞ্জন করা বর্ণনা 'তলোয়ার'-এর আরও অনেক রেটিংকে অন্তর্ঘাতী কার্য করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

তাঁর কয়েকজন সঙ্গী, যারা তখনও 'তলোয়ার'-এ উপস্থিত ছিল, তারা গোপন আন্দোলনকে আরও সুবিধাজনকভাবে জোরদার করার সুযোগ পেয়েছিল। সর্বত্রই শ্লোগান্ লিখিতভাবে দেখতে পাওয়া গেল।

একদিন 'তলোয়ার'-এর কয়েকটি গাড়ি অসাবধানতাবশত চারপাশে চকচকে ব্রিটিশ-বিরোধী শ্লোগান্ বহন করেই সহরের ভেতর দিয়ে চলে গেল। তাতে কর্তৃপক্ষ হয়ে পড়লো খুবই উদ্বিগ্ন। এই গাড়িগুলো সাধারণতঃ সকালের দিকে বেরিয়ে আসতো সহরের বাইরের ডিপোগুলোতে এবং সেখান থেকে দুধ ও রেশনের জিনিস নিয়ে যেতো 'তলোয়ার'-এ। শ্লোগান্‌গুলো লেখা হয়েছিল রাত্রিতেই। এমন কি কমাণ্ডার কিং-এর গাড়িও নজরের বাইরে যেতে পারেনি। সে গাড়ির গায়েও স্থান পেল ব্রিটিশ-বিরোধী শ্লোগান্।

দেশের পরিস্থিতি অনুসারে বুদ্ধিমান লোক হলে সে হয়তো চেষ্টা করতো কৌশলের সাহায্যে নৌ-বিভাগে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে পরিস্থিতি সামলে নিতে। কিন্তু কিং ছিলেন পুরাতনপন্থী। যুদ্ধ-পূর্ব নৌ-বিভাগের আবহাওয়াতে মানুষ, লম্বা জমকালো জবরদস্ত কিং ছিলেন বেশ দক্ষ অফিসার। সে সময়কার অশিক্ষিত রেটিংদ্বারা পুষ্ট নৌ-বিভাগের আবহাওয়ায় তিনি ছিলেন একজন বেশ মানানসই অফিসার। তাঁদের মতো লোকই ছিলেন আগেকার ব্রিটিশ-ভারতের যুদ্ধ-বিভাগের মেরুদণ্ড। তাঁরাই ছিলেন কিপ্লিং-এর ভারতের কঠিন, একগুঁয়ে, রোদে পোড়া তামাটে বর্ণের অবিচল নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের প্রতীক—তাঁরাই গর্ব বোধ করতেন ভারতের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ বলে। তাঁরা এ দেশকে ভালবাসতেন নিজেদের কায়দায়, কিন্তু তাঁরা জানতে চাননি দেশের লোকদের। নতুন রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী ছিল কিং-এর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের ভাষা জানবার মতো ধৈর্য ছিল না তাঁর। আমাদের চিন্তাধারার তাৎপর্য উপলব্ধি করা ছিল তাঁর পক্ষে আরও দুঃসাধ্য।

১৯৪৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি, যখন মিঃ কিং মহিলা ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (যে-ব্যারাকের সাথে প্যারেল বস্তীর মহিলা সমিতির নেত্রী শ্রীমতী কমলা ডোণ্ডে গোপন সংস্থার কাজে নিযুক্ত ছিলেন) তখন কয়েকজন তাঁকে (মিঃ কিংকে) টিটকিড়ি মেরে বেড়ালের ডাক ডাকতে থাকে। কিং রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যারাকের ভেতরে ঢুকে চাবুক মারতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, "তোমরা মাদী কুকুরের বাচ্চা, কুলীর বাচ্চা, অসভ্য জংলীর বাচ্চা !" (**You are sons of bitches, sons of coolies, sons of bloody junglees !)**

রেটিংরা এতে চুপ করে থাকলো না। মেয়েরা এবং ছেলেরা মিলে হৈ-হৈ করে তাঁকে তাড়া করলো। মিঃ কিং সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনরকমে পালিয়ে গেলেন। এর প্রতিবাদে চৌদ্দজন রেটিং সঙ্ঘবদ্ধভাবে (যদিও তা মিলিটারী ভাষায় বিদ্রোহ) অভিযোগ পেশ করলো এক্‌জিকিউটিভ অফিসার লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মিঃ শ-এর নিকট। তিনি আবার তা পাঠিয়ে দিলেন মিঃ কিং-এর কাছে।

মিঃ শ পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগত এক চিঠিতে তিনি চেয়েছিলেন মিঃ কিং-কে সচেতন করতে। কিন্তু কিং তা গ্রাহ্যই করলেন না। শুনানীটা স্থগিত রেখে দিলেন প্রার্থনা-শুনানীর নিয়মমাফিক দিন পর্যন্ত,—"**To his normal day for hearing request.**" ফেব্রুয়ারির ১৬ তারিখে যখন অফিসের কানুনমাফিক তাদের (সৈন্যদের) অভিযোগ শুনেলেন, তখন তিনি (মিঃ শ) সৈন্যদের উল্‌টে দোষী সাব্যস্ত করে ছাড়লেন এই বলে যে, "তোমরা মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করেছো।" সৈন্যদের (রেটিংদের) বিবেচনা করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার সময় দেওয়া হলো। রেটিংরা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলো ভীতি-প্রদর্শন বলে।

এদিকে লালকেল্লায় আই. এন. এ-র যুদ্ধ-বন্দীদের বিচার আরম্ভ হয়েছে। কংগ্রেস এঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের দ্বারা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করাচ্ছেন। রেটিংরাও এই কাজে নেমে পড়লো গোপন সংস্থার নির্দেশ মতো। কেননা, এই কাজের মধ্য দিয়ে সৈন্যদের মধ্যে সংহতি এবং বিপ্লব-চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তাই রেটিংরা ঐ বন্দীদের খালাশ করে নিয়ে আসার জন্যে ব্যারাকে ব্যারাকে, জাহাজে জাহাজে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ-সবই হচ্ছিল কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে, তাঁদেরই নির্দেশে। কর্তৃপক্ষ কিন্তু যা-হোক চোখ বুজে আছে, দেখেও যেন দেখছে না, বুঝেও যেন না বোঝার ভান্। এই আবহাওয়ায় অনেক কাজের সুযোগ এসে গেল। সেই রাতেই এক গোপন সভা করার প্রস্তাব নেওয়া হলো। সেই সভায় খসড়া তৈরী হবে সংগ্রামের।

১৭ই ফেব্রুয়ারির রাত। সকলে মিলিত হয়ে স্থির করলো একটা কাজের ধারা। সবাই বসেছিল সেই 'তলোয়ার'-এ। স্মরণীয় সেই '১৮ই ফেব্রুয়ারি' সমাগত। এই দিনেই বিদ্রোহ শুরু করার জন্যে কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি (গোপন সংস্থা) ১৯৪৪ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিদ্রোহ হয়েও ছিল। কিন্তু, কোন এক সদস্যের গাফিলতির ফলে ঠিক ঠিক সময়ে যোগাযোগের অভাবে তা সফলতা লাভ করতে পারেনি। তাকে স্মরণে রেখেই ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আবার বিদ্রোহ শুরু করা হবে। ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সাল অনেক অনেক বেশি উপযুক্ত। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্রোহের অনুকূলে। ১৯৪৫ সালে এই সুযোগ গ্রহণ করা যায়নি। তখন নৌ, স্থল ও বিমান-বাহিনীতে একটা ভাঙা-গড়ার অবস্থায় সেনানীরা কতকটা মনমরা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে

সেনানীরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা নিয়ে নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে এলো, তখন আবার সেই সঙ্ঘবদ্ধ আদর্শ নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। মাঝে মাঝে তার পরীক্ষাও হয়ে গেছে। তাতে তারা কিছুটা সফলতাও লাভ করেছে। তার কারণ, পূর্বের তুলনায় সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ-রাজ এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সময়ে যদি ঠিক-ঠিকভাবে তাকে আঘাত করা যায় তবে তাকে তাড়ানো অসম্ভব হবে না। তাই এই '১৮ই ফেব্রুয়ারি' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

ঠিক হলো, ১৯৪৪ সালে এই তারিখেই নিকৃষ্ট খাবার খাবে না বলে আন্দোলনের যে 'ডাক' দেওয়া হয়েছিল, এখনও সেই নিকৃষ্ট খাবার দেওয়া হচ্ছে। বরং পূর্বের তুলনায় এখন খাবার আরও নিকৃষ্টতর। অতএব রেটিংরা ঐ খাবার গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ আবার সেই 'খানা বন্ধ্'—('no food, no work')—'না-খাবার, না-কাজ'। নতুনভাবে নৌ-বাহিনীতে কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক্ কমিটি তৈরী হলো আন্দোলন পরিচালনার জন্য। স্থল ও বিমান-বাহিনীতেও অনুরূপভাবে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলো কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে।

দেশের সার্মগ্রিক জনগণের মনে আস্থা অটুট রাখার জন্যে পাঞ্জাবী মুসলমান মিঃ এম্. এস্. খানকে (তিনি একজন নৌ-বাহিনীর প্রধান সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্) সভাপতি এবং পাঞ্জাবী শিখ মিঃ মদন সিংকে (নৌ-বাহিনীর একজন টেলিগ্রাফিস্ট) সহ-সভাপতি করে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধন দ্বারা ছত্রিশ জনের সদস্য নিয়ে এক স্ট্রাইক্ কমিটি তৈরী হলো। সংক্ষেপে একে বলা হলো,—এন্. সি. এস্. সি. (নেভাল্ সেন্ট্রাল্ স্ট্রাইক্ কমিটি)। বাইরে গোপন সংস্থা সংযোগ রক্ষা করে চলতে থাকলো। আমি জানতে পেরেছিলাম, অন্য দুই বাহিনীতেও (স্থল ও বিমান-বাহিনীতেও) অনুরূপভাবে (পৃথক পৃথকভাবে) স্ট্রাইক্ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

পুর্বেই বলা হয়েছে, এইবারে যেহেতু আমি শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, সেই হেতু আমাকে সমগ্র গোপন সংস্থার কাজে যুক্ত না রেখে সীমাবদ্ধভাবে নৌ-বাহিনীতে তার সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত রাখা হয়েছিল। তাই অন্য দুই স্ট্রাইক্ কমিটির (স্থল ও বিমান) নেতৃস্থানীয়দের নাম আমার জানার সুযোগ হয়নি। নৌ-বাহিনীর কথাই তাই বলতে পারি। আমরা আবার বিদ্রোহের দিকে এগোতে লাগলাম।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। নিয়মমাফিক ভোর পাঁচটায় এইচ্. এম্. আই. এস্ (হিজ্ ম্যাজেস্টিস্ ইণ্ডিয়ান্ শিপ্) 'তলোয়ার'-এর রেটিংদের জাগিয়ে তোলা হলো। সকাল ৮টায় তারা চলে গেল প্রাতঃরাশের জন্য মেসের কামরাগুলোতে। সংখ্যায় তারা দেড় হাজারেরও বেশি। হঠাৎ একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। শীঘ্রই চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকগুলো বেরিয়ে এলো মেস্-হলের বাইরে। খাবার খাবে না তারা—খাবার নিকৃষ্ট, অপর্যাপ্ত। শ্লোগান্ উঠলো,—"No food, no work"—না-খাবার, না-কাজ। পুরো রাজনৈতিক ধাপে উঠবার পূর্ব ধাপ।

সিদ্ধান্ত মতো 'খানা বন্ধ্' শুরু হয়ে গেল। কেউ খাবার গ্রহণ করছে না। কর্তৃপক্ষ হতভম্ব। পূর্বের মতো জুনিয়ার অফিসাররা এসে রেটিংদের বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলো তাঁদের প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষের মাথায়ও ১৯৪৪ সালের ঘটনা বার বার উঁকি মারতে লাগলো। ধাক্কাও যে মনের দিক দিয়ে খাচ্ছিলেন না, তা বলা যায় না। নিরাশ হয়ে তাঁরা চলে গেলেন। পুরো পাঁচঘণ্টা কেটে গেল। রেটিংরা দলবদ্ধ হয়ে এখানে-সেখানে জটলা করতে লাগলো। রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হলো। তখন প্রতিটি মুহূর্তই ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। 'তলোয়ার' এবারে অবাধ্য, উদ্ধত হয়ে দাঁড়ালো।

দুপুর প্রায় ১টার সময়ে ফ্লাগ্ অফিসার রিয়ার অ্যাড্মিরাল্ র‍্যাট্রে (Flag Officer Rear Admiral Rattray) ছুটে এলেন 'তলোয়ার'-এ। ইনি এখন বোম্বাইয়ের নৌ-বাহিনীর সবচেয়ে বড় অফিসার। ১৯৪৪ সালের আন্দোলনকে চাতুরির দ্বারা কৌশলে দমন করার পরেই তাঁর এই পদোন্নতি ঘটেছিল। রেটিংদের কাছে তিনি এসে সোজাসুজিই প্রস্তাব রাখলেন, কমাণ্ডার কিং-কে বদলী করে আনবেন ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্‌কে (Inigo Jones)। এমনকি খাবারের প্রশ্নও সহানুভূতি সহকারে দেখতে চাইলেন।

কিন্তু রেটিংরা ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্-এর নাম শুনেই আঁতকে উঠলো। এই জোনস্ সাহেবই তো ১৯৪৪ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি এম্. আর. ব্যারাক্স এবং ক্যাসেল্ ব্যারাকে নিরস্ত্র রেটিংদের গুলী করে মেরেছিল। করাচীসহ মোট ৫,৫০০ জন রেটিংকে বন্দী করে কোর্ট-মার্শালের আইনে দণ্ড দিয়ে (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) মুলতান মিলিটারী জেলে পাঠিয়েছিল তিলে তিলে মৃত্যু-বরণ করতে। বহু রেটিং বা সৈন্য সেখানে প্রাণ হারিয়েছে। সর্বোপরি দুই বীরাঙ্গনা নারীকে ওরাই তো ষড়যন্ত্র করে নিষ্ঠুরভাবে 'চাঁদ্মারি' করে হত্যা করেছে। তখনও এই মিঃ র‍্যাট্রে সাহেব স্তোকবাক্য দিয়ে বলেছিলেন, ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্ অন্যায়ভাবে গুলী চালিয়েছিল; সুতরাং তাকে শাস্তিস্বরূপ বদলী করে কমাণ্ডার কিং-কে এখানে আনা হলো। আজ আবার বলছেন, কমাণ্ডার কিং-কে বদলী করে ক্যাপ্টেন্ ইনিগো জোনস্‌কে এখানে আনবেন। বলিহারি তাঁর চাতুরির খেলা!

রেটিংদের কাছে তাঁর ধাপ্পা অতিসহজেই ধরা পড়ে গেল। রেটিংরা বুঝলো ইনিগো জোনস্ বা কমাণ্ডার কিং উভয়েই এক। ছুরির এ-পিঠ আর ও-পিঠ মাত্র। নামের কোন মূল্য নেই। তাই রেটিংরা চীৎকার করে স্তব্ধ করে দিল তাঁর প্রস্তাব, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান্ উঠলো সমস্বরে, **Quit India!** শ্লোগান্ অনুরণিত হতে থাকলো

বাতাসের তালে তালে। মিঃ র‍্যাট্‌ট্রে বেগতিক বুঝে তাঁর ফ্লাগ্‌-শিপে চলে গেলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সমস্ত দিন-রাত কেটে গেল। খাবারগুলো পড়ে থেকে নষ্ট হলো। 'তলোয়ার'-এ একটি ইংরাজেরও পাত্তা পাওয়া গেল না।

যে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তার ফলাফলের বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সৈন্য-বিভাগের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই যুদ্ধ করছিলাম। সফলতা আসুক বা ব্যর্থতাই আসুক চেষ্টা আমাদের কিছুটা ফলবতী হতে বাধ্য। কিছু কিছু ভারতীয় অফিসার তখনও কাজ করছিলেন। কারণ, পদমর্যাদা এবং সামান্য একটু সুযোগ-সুবিধাই ছিল তাঁদের কাছে খুব বেশি আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিবাদ করতে গেলে যে অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়! তাদের মধ্যে দু'-একজন যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, "জাতীয়তাবাদী নেতারা আর জাতীয়তাবাদী সংবাদ-সংস্থাই তো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। এই ব্যাপারটা তাঁরাই আমাদের চেয়ে ভাল জানেন। আমরা কেন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ব?" এই ধরনের বক্তা-অফিসারদের মধ্যে আমি জানি কোন একজন বাঙালী অফিসার ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশের পদলেহন করে 'ভাইস্‌-অ্যাডমিরাল্‌' পদে উন্নীত হয়ে বর্তমানে কর্মভার থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

আরব সাগরে তখন সূর্য অস্তমিত। 'তলোয়ার'-এ ধর্মঘট-কমিটির সভা বসেছে। আলোচনা করে প্রথমে দাবী তোলা হলো, 'আমাদের উন্নত ধরনের চাকুরির ব্যবস্থা আর উন্নত ধরনের খাদ্য।' এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরী করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ফিরিস্তি-সহ আরও একপ্রস্থ দাবী তোলা হলো, 'আই. এন. এর বন্দীদের সমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি; ইন্দোনেশিয়া থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে আনা, কিং-কে শাস্তি দেওয়া; ভারত ছাড়ো'

ইত্যাদি। দেশবাসীকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাবার জন্যে সন্ধ্যা ৭টায় প্রস্তুত হলাম আমরা।

এ খবর বোম্বাই প্রেসের কাছে যখন পৌঁছে দেওয়া হলো, বলতে গেলে, তখন তারাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। দৃঢ় জাতীয়তাবাদী মতের ঐতিহ্যবহনকারী 'ফ্রি প্রেস্ জার্নাল্' দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এস্. নটরাজন্ এই চাঞ্চল্যকর সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। সাহসে ভর করে রেটিংদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সংবাদপত্রের কলমের সদ্ব্যবহার করতে। প্রেসে সাধারণতঃ সরকার-প্রকাশিত সংবাদই প্রচার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে বৈকি! ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বাকী সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদ সংস্থার মধ্যে কেউ-বা আমাদের করলেন অবিশ্বাস, কেউ-বা সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না। 'ফ্রি প্রেস জার্নাল্' আমাদের প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠলো। পরবর্তীকালে বিদ্রোহের খবরের জন্য তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছিল ঐ সংবাদপত্রের সমস্ত খবর।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। অতি ভোরে ক্যাসেল্ ব্যারাকে খবর পৌঁছলো 'তলোয়ার'-এর ওপরে গুলী চালিয়েছে। ক্যাসেল্-ব্যারাক্ সহ সমস্ত ব্যারাকগুলো 'খানা বন্ধ'-এঁর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তখনও তা ছিল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যদিও মিলিটারীতে তা 'বিদ্রোহ' ভাষায় অলঙ্কৃত। এবারে গুলী চালনার ঘটনার ফল হলো মারাত্মক। 'তলোয়ার-এর সৈন্যদের গুলী করে মেরে ফেলছে',—এই সংবাদে সবাই ক্ষিপ্ত হলো। তখন সকলেই মারমুখো হয়ে ছুটে আসতে লাগলো 'তলোয়ার'-এর দিকে। 'তলোয়ার' কিন্তু তখন স্বাধীন। ব্রিটিশরা তো

আগেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। হয়তো বা মনেও ভয় ঢুকেছিল, ১৯৪৪ সালের প্রতিশোধ ভারতীয়রা এবারে নেবে ভেবে।

১৯শে ফেব্রুয়ারির সূর্য অস্তমিত। 'তলোয়ার' এখন আর একা নয়। বোম্বাইয়ের তীরে এগারোটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় কুড়ি হাজার রেটিং মিলিত হয়েছে। পোতাশ্রয়ের সব জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে 'ইউনিয়ন জ্যাক্'। আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে পরের দিন সকালে ভারতীয় নৌ-সেনার সকল সংস্থা থেকেই ব্রিটিশরা তাঁদের প্রভুত্ব হারিয়ে ফেললো। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো চুয়াল্লিশটি জাহাজে, চারটি মেজর বেস্-এ, চারটি ফ্লোটিলাতে এবং কুড়িটি সমুদ্র-তীরবর্তী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে ১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। 'খাইবার' জাহাজ তখনও নিখোঁজ ছিল। সেই 'খাইবার' জাহাজও এবারে এই দিনে বোম্বাইতে এসে গেছে। যুদ্ধের সময়ে জার্মান টর্পেডোর আঘাতে জখম হয়ে ভাসতে ভাসতে জাহাজ গিয়েছিল ফ্রান্সের উপকূলে। সেখানে জার্মান নাৎসীরা ঐ জাহাজসুদ্ধ সবাইকে বন্দী করে রাখে। যুদ্ধ শেষে ছাড়া পেয়ে এবারে ভারতে এলো। বোম্বাইয়ে এসে নোঙ্গর ফেললো।

বোম্বাইয়ে 'তলোয়ার' জাহাজ হলো নাবিকদের সংগ্রামী কমিটির ঘাঁটি। সেখান থেকে সাঙ্কেতিক বেতার-বার্তায় নির্দেশ ছুটলো প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকের কাছে, "যদি দেশকে ভালোবাসো, যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করো তবে ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বহরের হরতালে সামিল হও।" 'খাইবার' জাহাজ তখন ছিল আরব সাগরের মাঝখানে, যাচ্ছিল করাচী। সঙ্কেত পেয়ে ছুটে এলো বোম্বাইয়ে। আনন্দ আর ধরে না। একে তো গেল যুদ্ধে 'খাইবার' নিখোঁজ হয়েছিল, তার ওপরে যখন সে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেছে তখন কর্তৃপক্ষ তাকে বলেছিল করাচী যেতে। কারণ অতি পরিষ্কার। কর্তৃপক্ষ জানতো 'খাইবার'-এর

অতীত বীরত্বের কথা। তাই সে যাতে বর্তমান নৌ-বিদ্রোহে যোগদান না করতে পারে তার জন্যই তাকে নির্দেশ দিয়েছিল করাচী যেতে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের কী দুর্ভাগ্য, তখনও পর্যন্ত তাঁরা জানতেন না যে, করাচীও আন্দোলনে নেমে পড়েছে। তাই, 'খাইবার' যখন বেতার-সঙ্কেতে জানতে পারলো যে, বোম্বাইয়ের সমস্ত জাহাজ, ব্যারাক্ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, ব্রিটিশ সৈন্য তাদের ওপরে গুলী চালাচ্ছে, অনেককে হত্যা করেছে, তখন তার (জাহাজের) ভারতীয় নাবিকেরা জাহাজের ইংরাজ অফিসার ও গোরা সৈন্যদের বন্দী করে রেখে নিজেরা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে এলো বোম্বাইয়ে। 'খাইবার'ও যোগ দিল আন্দোলনে।

ওদিকে ক্যাসেল্ ব্যারাকে একদল ভারতীয় রেটিং উদাত্তকণ্ঠে বলতে লাগলো, "হে ক্যাসেল্ ব্যারাকের বন্ধুগণ, তোমরা তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো খুইয়েছো তোমাদের বিদেশী প্রভুদের হয়ে যুদ্ধ করে। এখন তোমাদের ভাইদের রক্ত দিয়ে দেওয়া হলো তার পুরস্কার। 'তলোয়ার'-এর ওপরে গুলী করে, বেয়নেটের খোঁচায় মেরে ফেলছে ব্রিটিশ টমীরা তোমাদের ভাইদের। চলে এসো, আর বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। লেগে পড়ো—দেশ মুক্ত করার কাজে, স্বাধীনতা আনার কাজে।"

এই আহ্বান জানিয়ে সংবাদবাহকরা ছুটে বেরিয়ে গেল। পাগলের মতো রেটিংরা তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো। বিদেশীদের যা-কিছু চোখে পড়লো তা দেখে তাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করলো। শহরের বড় বড় সড়ক দিয়ে যেতে যেতে বিদেশীদের দেখতে পেয়েই তখনই তাদের তাড়া করলো। তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। বিশেষ করে বিদেশী মালিকদের দোকানগুলোর ওপরে পাথর পড়তে লাগলো। টেনে নামিয়ে ফেলা হলো ইউ. এস্. আই. এস্. লাইব্রেরীর পতাকা। চীৎকার করতে লাগলো শ্লোগান্ দিয়ে 'ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ!' ব্রিটিশ

মালিকানার সমস্ত সান্ধ্য সংবাদপত্রে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে বড় বড় হরফে আর্তনাদ প্রকাশিত হলো, "নৌ-সৈন্যরা খুনের নেশায় মেতেছে।"

এবারের আন্দোলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনেক ভারতীয় অফিসার রেটিংদের সঙ্গে যোগদান করলেন। এ যুদ্ধে শুধু বোম্বাইয়ের নৌ-সেনারা নয়, করাচীর 'হিন্দুস্থান' জাহাজও যোগ দিয়েছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে 'বাহাদুর,' 'হিমালয়,' চম্পক' এবং করভেট্ 'ত্রিবাঙ্কুর'। সর্বোপরি এখানে—করাচীতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীযুত বিন্ধ্যা সিং। আজ করাচীও উত্তাল-উদ্দাম। আর যোগদান করেছিলেন মহান বোম্বাইয়ের, মহান মহারাষ্ট্রের ও মহান করাচীর বীর জনগণ।

কলকাতাও অবশ্য চুপ করে ছিল না। স্থল ও বিমান-বাহিনীতেও আলোড়নের সৃষ্টি হলো। গোপন সংস্থার গুপ্ত জাল চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল বলেই সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। সবগুলো জাহাজে, ব্যারাকে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হলো। তা ছাড়া স্থল ও বিমান-বাহিনীও যে পা বাড়িয়েছিল এবং বাইরে দেশের জনগণও যে এই বিদ্রোহের অংশীদার হয়েছিল, তাও ঐ গুপ্ত সংস্থার প্রচেষ্টায়। নতুবা বিস্তৃত বিদ্রোহ না হলে ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ সরকার কেঁপে উঠবে কেন?

ঘন ঘন সেণ্ট্রাল স্ট্রাইক্ কমিটি বসছে। তাঁরা এবারে সিদ্ধান্ত নিলেন, আর. আই. এন.-এর এখন থেকে নতুন নামকরণ করা হলো, "ভারতীয় জাতীয় নৌ-বহর" (Indian National Navy)। আরও সিদ্ধান্ত নিলেন, "এখন থেকে কেবলমাত্র জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই আর. আই. এন.-এর রেটিংদের নির্দেশ নিতে হবে।" এই বিদ্রোহের সংবাদ এবং প্রস্তাবগুলিও 'ফ্রি প্রেস জার্নাল্', দৃঢ়-চেতা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র, যার সম্পাদক হলেন মিঃ এস্. নটরাজন্, খুব বড় করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপলেন। তিনি এবারে সত্যকে চাপা দিলেন না। ঐ সময়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

বোম্বাইয়ে ছিলেন। তিনিও সংবাদ পড়লেন এবং গুরুত্বও দিলেন। তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন, বামপন্থীদলগুলোকে বাদ দিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা। কিন্তু ঘটনার গতি নিয়ে গেল অন্য দিকে। সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেল, সমস্ত নৌ-বহর ভারতীয় সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে। স্থল ও বিমান-বাহিনীও বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। এই সংবাদ 'ফ্রি প্রেস জার্নাল্' তার কাগজে বের করে দেওয়ায় অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলি এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও বাধ্য হলো ঘটনাকে তাদের সংবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে।

আমাদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই প্রচার লাভ করলো, তবুও জাতীয় নেতাদের মধ্যে কোন একজনকেও দেখা গেল না রেটিংদের জন্য অভিনন্দন পাঠাতে বা তাদের নির্দেশ দেবার জন্য কোনরকম উদ্যম প্রকাশ করতে। খবর পড়ে কিন্তু ভারতের জনগণ (কোন কোন নেতা বাদে) আনন্দে দু'হাত তুলে ভারতীয় নৌ-সেনানীদের আশীর্বাদ করতে থাকেন। বহুদিন ধরে তাঁদের (জনগণের) আশা—ব্রিটিশকে তাড়ানোর কাজ এবারে সফল হবে।

এই সময়ে নৌ-বাহিনীর স্ট্রাইক্ কমিটির পক্ষ থেকে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো 'তলোয়ার'-এ আসতে। কারণ 'তলোয়ার' ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি। আর বীরত্বের ও দেশপ্রেমের পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছিল 'খাইবার'। এই 'খাইবার' জাহাজই আবার বীরত্বের পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়েছিল গত ১৯৭১ সালের ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে। সত্যই তাঁর দেশপ্রেম অতুলনীয়। স্ট্রাইক্ কমিটি এবারে তাঁদের দাবীগুলো ঠিক করে নিলেন নেতাদের দেখাবার জন্যে। দাবীগুলো হলো :

(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যেকের মুক্তি চাই।

(২) 'তলোয়ার' জাহাজের নায়ক কমাণ্ডার কিং-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চাই।

(৩) অস্থায়ী সামরিক কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থা চাই।

(৪) ব্রিটিশ নাবিকদের সমান অনুপাতে ভারতীয় নাবিকদেরও ভাতা দিতে হবে।

(৫) ক্যান্টিনে ইংরাজ ও ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে বৈষম্য চলবে না।

(৬) খাবার উন্নত করতে হবে।

(৭) নৌ-বহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে পোশাক ফেরৎ নেওয়া চলবে না।

(৮) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ ব্যবহার করা চলবে না—ইত্যাদি, গোপন সংস্থা থেকে যা ঠিক করে দিয়েছিল তাই রাখা হলো। স্থল ও বিমান-বাহিনীতেও অনুরূপভাবে দাবী রাখা হয়েছিল। শুধু 'নৌ-বাহিনীর' স্থলে—'স্থল' ও 'বিমান-বাহিনী' ব্যবহার করার নির্দেশ ছিল। এই ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে নৌ, স্থল ও বিমান-বাহিনীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার পথ খোলা রাখা হয়েছিল।

একথা পূর্বেও বলা হয়েছে, রেটিংদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই প্রচারলাভ করলো, তবুও জাতীয় নেতারা বা তাঁদের মধ্যে কোন একজনকেও দেখা পাওয়া গেল না তাদের (রেটিংদের) জন্য অভিনন্দন পাঠাতে বা তাদের নির্দেশ দেবার জন্য কোনরকম উদ্যম প্রকাশ করতে। তবে কি তারা (রেটিংরা) ভুল করেছে? নেতারা নীরব কেন? রেটিংদের কাছ থেকে তাঁরা (জাতীয় নেতারা) কী আশা করেছিলেন? তাঁদের কাছে গিয়ে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন!—ইত্যাদি চিন্তায় রেটিংরা মনের দিক থেকে সংশয় প্রকাশ করতে থাকে। নৌ-বিভাগ ছিল তাদের কব্জার মধ্যে। স্থল-বাহিনী এবং বিমান-বাহিনীও তাদের সঙ্গে রয়েছে।

গতকাল বোম্বাইয়ের ফ্লাগ্ অফিসার রিয়ার অ্যাডমিরাল্ র‍্যাট্রের ফ্লাগ্-শিপে ছয় ঘণ্টাব্যাপী আপোষ-আলোচনা চলে।

গড্‌ফ্রে সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। আটটি দাবীর একটিও তাঁরা মানলেন না। ওরা বললেন, নৌ-বহরে হরতাল বলে কিছু নেই, হরতাল মানে 'বিদ্রোহ'।

এদিকে বোম্বাইয়ের বন্দরে যত জাহাজ ছিল, সব জাহাজ থেকে উড়ছে কংগ্রেস-লীগ-কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকা রজ্জুবদ্ধ ঐক্যের প্রতীক হয়ে। সেখানে ছিল, 'বেরার', 'মোতি', 'নীলাম', 'যমুনা', 'কুমাওন', 'আউধ', 'মাদ্রাজ', 'সিন্‌ধ', 'মারাঠা', 'তীর', 'ধনৌজ', 'আসাম', 'নর্মদা', 'ক্লাইভ্‌' এবং 'লরেন্স্‌' জাহাজগুলো। উপকূলে ফোর্ট্‌ ব্যারাকে, এম্‌. আর. ব্যারাক্‌সে এবং ক্যাসেল্‌ ব্যারাকেও উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতেও স্বাধীনতার পতাকা পত্‌পত্‌ করছিল। কিন্তু তবুও দেখা গেল, কোন নেতাই এলেন না রেটিংদের সঙ্গে কথা বলতে। অথচ রেটিংরা মনে করত ভারতীয়দের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর একতাবদ্ধ হয়ে (যেমন রেটিংরা করেছেন সর্বধর্মের, সর্বজাতির, সর্বরকম রাজনৈতিক মতবাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে) দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

নৌ-বিভাগ দখল করা হয়েছে সবার প্রয়োজনে। নেতারা যে আসেননি, তার মূল কারণ হলো, তাঁরা তখনও পর্যন্ত চেয়েছিলেন রেটিংরা নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই একটা যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুক। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল মিটিয়ে নিক। বিশেষ করে তাঁরা তখন ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার পার্লামেন্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এই ঘোষণায় কিছু নতুনত্বের সন্ধান ছিল বলেই তাঁরা (নেতারা) ওদিকে ঝুঁকে পড়েন। বলা যায় নৌ-বিদ্রোহের গুরুত্বকে কতকটা উপেক্ষা করেই তাঁরা চলছিলেন। ঐ ঘোষণায় ছিল,—"ভারত-সচিব (লর্ড প্যাথিক্‌ লরেন্স্‌) বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌) এবং ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটি-কে (মিঃ এ. ভি.

আলেকজাণ্ডার) নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের এক বিশেষ মিশনকে সংবিধান গঠনকারী সংস্থা নিয়োগ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনপুষ্ট শাসন-পরিষদ গঠনের জন্য ভারতের নেতাদের সহিত আলোচনার্থে প্রেরণ করা হবে। মন্ত্রিসভার এই সদস্যগণ বড়লাটের সাথে একযোগে কাজ করবেন।" এই ঘোষণাই 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর সৃষ্টি করলো।

এই ঘোষণার সঙ্গেই ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ দিল্লীতে এসে ১৩ই এপ্রিল করাচী হয়ে লণ্ডন যাত্রার পূর্বে যে ব্রিটিশ সরকারের খসড়া ঘোষণার প্রস্তাবগুলো পেশ করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখতেই দেশের নেতারা ব্যস্ত ছিলেন। সেই খসড়া ঘোষণার প্রস্তাবগুলো ছিল এইরূপ :

(১) যুদ্ধ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নতুন সংবিধান রচনার জন্যে একটা নির্বাচিত সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

(২) সংবিধান রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) সর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সংবিধানটিকে স্বীকার ও অবিলম্বে কার্যকরী করবে।

(৪) প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর (Lower Houses) সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান রচনাকারী সংস্থা নির্বাচিত হবে।

(৫) নতুন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু স্বদেশ, কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘের সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলোর নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করাই ব্রিটিশ সরকারের কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, পরবর্তী নতুন ঘোষণা (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) নতুনত্ব নিয়ে কোনরূপ সর্তহীনভাবে আগমন করলো—'নৌ-বিদ্রোহ'

যখন তুঙ্গে আরোহণ করেছে এবং স্থল ও বিমান-বাহিনী যখন বিদ্রোহের দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে কি ব্রিটিশ-সিংহ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়েই 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল ? এর উত্তর পাঠক-পাঠিকাদের কাছেই রেখে দিলাম। তবে নেতারা যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহীদের ভুল পথে পরিচালনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অনেকেই আশা করেছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের এই সংগ্রামে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী এসে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। কেননা, '৪২-এর আন্দোলনে তিনি তো ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সেজেছিলেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব এগিয়ে আসা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিদ্রোহীদের ! তিনি শুধু উপদেশ দিলেন "শান্ত থাকো" (**Remain calm**)। তাঁর কথা যেন কানে লাগলো মহাত্মা গান্ধীর প্রতিধ্বনি হয়ে। নৌ-বিভাগ ছিল নাবিকদের কব্জার মধ্যে। সৈন্যবাহিনী (স্থল ও বিমান) ছিল তাদের সঙ্গে। এমনি সঙ্কট ও সুযোগের সন্ধিক্ষণে শ্রীমতী আসফ আলী নাবিকদের দাবীগুলির মধ্যে আইনের ছিদ্রের ব্যাখ্যা করতে বসলেন।

তাঁর মতে প্রথমত নাবিকদের চাকুরির অভিযোগগুলি নাবিকরা গুলিয়ে ফেলেছে রাজনৈতিক দাবীর সঙ্গে। সুতরাং তিনি নাবিকদের অনুরোধ করলেন, ঐ দু'টোকে পৃথক করে ফেল। চাকুরির দাবীগুলো নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করো। নাবিকরা বললেন, "এখন নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ তো আমরাই।" শ্রীমতী আসফ আলী বুঝতে পারলেন নাবিকরা তাদের দাবীর খসড়া তৈরীর সুবাদে তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসেনি। এসেছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাবার আশায়।

তাই তাড়াতাড়ি তিনি তাদের (নাবিকদের) নির্দেশ দিলেন বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীমতী আসফ আলী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পরে সংবাদপত্রে পরিষ্কার করে বলেছিলেন, "ওরা (রেটিংরা) যা চেয়েছিল সেটা হচ্ছে, জাতীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে ওদের ন্যায্য সমর্থন লাভ করা।" তাঁর হাতে আরও জরুরী (এই বিদ্রোহের চেয়েও জরুরী?) কাজ থাকায় তাঁকে এরপরে শীঘ্রই বোম্বাই ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু তিনি বেচারী রেটিংদের জন্যে উমেদারী করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে একটা টেলিগ্রাম করলেন এই বলে যে, তখন বোম্বাইয়ে নেহরুজীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, একমাত্র তিনিই পারেন বোম্বাইকে বাঁচাতে, বোম্বাইকে রক্ষা করতে। পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে বুঝতে পারা গেল নেতারা নাবিকদের প্রচেষ্টাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সেই তারবার্তা তারই এক পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্তসার বা চুম্বক।

২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটায় মিলিটারী পুলিশের গাড়ি এসে তুলে নিতে লাগলো রেটিংদের,—যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই। সন্ধ্যাবেলায় যে ছবি দেখা গেল তা ভয়াবহ। এদিকে ব্যারাকে ব্যারাকে এবং জাহাজগুলোতে খাদ্যের ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছে। নানারকম গণ্ডগোলের মধ্যে খাদ্য মজুত করার দিকে লক্ষ্য ছিল কম। বিদ্রোহীরা চিন্তা করেছিলেন, দেশের নেতাদের ওপরেই যখন সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখন খাদ্যের ব্যাপারেও তাঁরা উদাসীন থাকবেন না।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় খাদ্যের ভীষণ টানাটানি দেখা দিল। মাঝে মাঝে প্যারেল বস্তী (ওয়াটার ফ্রন্ট্ বস্তী) থেকে গোপনে কিছু কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দেওয়া হতো বটে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগণ্য। অথচ যুদ্ধ করতে হলে খেতেও তো হবে। না খেয়ে যুদ্ধ কতদিন করা যায়? ওদিকে বোম্বাইয়ের রাস্তায়

রাস্তায় রক্তগঙ্গা বইছে। বোম্বাইয়ের জনগণ নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে সর্বত্র দু'দিনের হরতাল পালন করার নির্দেশ পেয়েছে। ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি সেই হরতাল পালনের দিন ধার্য হয়েছে। এই হরতালের আহ্বান করেছেন বোম্বাইয়ের শ্রমিক সংস্থাগুলি। জনগণ তাই রাস্তায় রাস্তায় নেমে পড়েছেন। গোরা সৈন্য তাদের মেশিনগান ও বোম্বার্ড-কার-এর গুলী দিয়ে তার মোকাবিলা করছে।

অ্যাড্‌মিরাল্‌ র‍্যাট্‌ট্রে জাতীয় নেতাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বিদ্রোহীদের ডাকে যখন নেতারা এলেন না তখন মিঃ র‍্যাট্‌ট্রে বোম্বাইয়ের সর্বত্র 'মার্শাল্‌-ল' জারি করে (মিঃ গড্‌ফ্রে,—নৌ-বাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসার, **F. O. C. R. I. N.**-এর নির্দেশ মতো) গুলী চালাবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ করাচীতেও বর্তালো। বোম্বাই ও করাচীতে বহু লোক গুলীতে প্রাণ দিল। সবচেয়ে বেশি নৃশংস হত্যালীলা চালিয়েছিল বোম্বাইয়ের প্যারেল বস্তীতে এবং ডক্‌-ইয়ার্ডে। সেখানে জাহাজের নাবিকদের পরিবার-পরিজন বাস করতেন। তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাইয়ের অধিবাসী। বিশেষভাবে বলা যায় 'খাইবার' জাহাজের সৈনিকদের আত্মীয়স্বজন (স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা, ভাই-বোন) প্রভৃতি ঐ বস্তীগুলোতেই ছিলেন বেশি। বোম্বাইয়ের রাস্তায় এবং ঐ সমস্ত বস্তীতে আনুমানিক প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোক প্রাণ হারালো অগ্নিবর্ষী গোলার আঘাতে। ঐ বস্তীতেই মহিলা সমিতির প্রধান নেত্রী শ্রীমতী কমলা ডোঙে-র দেহ গোরা সৈন্যদের শত সহস্র গুলীতে এবং বোমার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পথের ধূলায় মিশে গিয়েছিল।

এই ঘটনায় 'খাইবার' এবং 'নর্মদা' জাহাজদ্বয় চুপ করে থাকলো না। থাকার কথাও নয়। তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র ছিল, এবারে তারা তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। 'খাইবার' ঢুকেছিল ক্রীক্‌-এর ভেতরে সঙ্কীর্ণ প্রণালীতে ক্যাসেল্‌ ব্যারাকের আক্রান্ত সহযোদ্ধাদের

জীবন ফিরিয়ে দিতে। ব্রিটিশ নাবিক অতি দক্ষতা দেখাতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঁচটি শক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাজ দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করলো প্রণালীর মুখটি। উপকূল ঘিরে রেখেছে কিংস্ রয়েল্ রাইফেল্স্, ডারহাম্ লাইট্ ইন্‌ফেন্ট্রি, শ্রপ্‌সায়ার লাইট ইন্‌ফেন্ট্রি, আর ইলেভেন্‌থ্ শিখ রেজিমেন্টের ফৌজ, যারা সাঁজোয়া গাড়ি, হাল্‌কা কামান আর মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিলো। একমাত্র ওয়াটার ফ্রন্ট্ বস্তীর কিয়দংশ ছাড়া সেই লৌহ যবনিকায় কোনই ছিদ্র ছিল না। তারই মধ্য দিয়ে কামান দাগিয়ে দাগিয়ে এগোতে থাকে 'খাইবার'।

বোম্বাইয়ের সমুদ্র তীরে যেখানে যেখানে ইংরাজরা বাস করত, বিশেষভাবেই সেখানে সেখানে তীক্ষ্ণ নজর রেখে দূরপাল্লার কামান দাগতে থাকলো। বিশেষ করে ক্যাসেল্ ব্যারাকের যে-দিকটায় ইংরাজরা থাকত সেখানটা দূরপাল্লার কামান দাগিয়ে একরকম উড়িয়ে দেওয়া হলো।

এদিকে তীরে এবং শহরের মধ্যে জনতা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পথে মৃতদেহগুলি দেখে ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠলো। তারা বোম্বাইয়ের 'হর্ন-বি' রোডের যত ইংরাজ ব্যবসায়ীর দোকান ছিল, সবগুলো আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বিধ্বস্ত করলো। সেখানেও অনেক ইংরাজকে মেরে ফেলা হলো। এক কথায় বোম্বাই তখন বিদ্রোহী জাহাজীদের সম্পূর্ণ দখলে এসেছে। যে সমস্ত ইংরাজ ছিল, তারা সবাই পালিয়ে গেল।

এই সময়ে বোম্বাইয়ের সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "বন্ধুগণ, বোম্বাইয়ের নাগরিকবৃন্দ, নৌ-বহরের বীর জাহাজী ভাইরা, আমাদের অতি প্রিয় বোম্বাই শহরে আজ এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ই তারিখ থেকে দেশপ্রেমিক জাহাজীরা এক অভূতপূর্ব হরতাল আরম্ভ করেছেন। খাদ্য-বস্ত্র-ন্যায়বিচারের জন্য তাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তাঁদের আশু দাবি-দাওয়ার প্রতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ, সক্রিয় ও সর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছে এবং এ আশ্বাস আমি প্রতিটি জাহাজী ভাইকে দিচ্ছি যে, তাঁদের দাবী পূরণ না করে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের কোন উপায় নেই।

"কিন্তু কংগ্রেস গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, জাহাজীদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংগ্রামকে এমন একটা জঘন্য সহিংস রক্তারক্তির রূপ দিতে চেষ্টা করছে যে, তাতে জাহাজীদের দাবী আদায়ের পথই রুদ্ধ হতে বসেছে। যেমন নাকি আজ ভোরবেলায় 'খাইবার' নামক জাহাজের অতর্কিত অবিমৃষ্যকারিতায় বহু নিরীহ ব্রিটিশ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে ক্যাসেল্ ব্যারাক্স এলাকায়। জাহাজী ভাইদের কাছে কংগ্রেসের আবেদন, অহিংস প্রতিরোধের পথ ত্যাগ করে সর্বনাশ ডাকবেন না। কংগ্রেস আরও লক্ষ্য করছে বোম্বাই শহরে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি জাহাজীদের ন্যায্য দাবীগুলির সুযোগ গ্রহণ করে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

"আজ তারা অতর্কিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, মিছিল বার করে হর্ন-বি রোডের যত ইংরাজ দোকান আছে সবগুলো আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছে। আজ সন্ধ্যার মুখে ফ্লোরা ফাউন্টেন্ এলাকায় পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করায় বামপন্থী সুযোগ-সন্ধানীরা পুলিশের ওপর ইট-পাথর নিয়ে হামলা চালায়। ফলে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে।

"তারপর থেকে এখন পর্যন্ত পুরো বোম্বাই শহরে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে শ্রমিক এলাকাগুলি ও জাহাজী অধ্যুষিত ওয়াটার ফ্রন্ট্ এলাকায় খুন-জখম, অগ্নিসংযোগ ও রাহাজানি এক কলঙ্কময় আকার পরিগ্রহ করেছে। বামপন্থীরা আবার কালকেও সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকে সরকার সারা বোম্বাইয়ে সামরিক আইন জারি করেছেন। আমার আবেদন, কংগ্রেসের আবেদন, সাধারণ ধর্মঘট থেকে দূরে থাকুন।

শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনুন। বামপন্থীদের সর্বনাশা ফাঁদে পা দেবেন না।"

র‍্যাট্রে সাহেবের বাংলোতে ব্রিটিশ অফিসাররা মিলিত হয়েছেন। জনগণের উপরে যে আক্রমণ করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হচ্ছে। জনগণের পক্ষ থেকে কি ধরনের প্রতিরোধ হচ্ছে তাও আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। মিঃ র‍্যাট্রে আদেশ দিলেন, "গুলী চালান, আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে আগে সতর্ক করে তারপর গুলী চালাবার প্রয়োজন নেই। যেখানেই একটু হাঙ্গামা দেখবেন সেখানেই গুলী চালাবেন। আর মনে রাখবেন, ওয়াটার ফ্রন্ট্ বস্তীর লোকগুলো রাইফেল গ্রেনেড পিস্তল নিয়ে লড়ছে। আমি জানি পুরো বোম্বাই শহরে আগুন জ্বলছে। কিন্তু ঐ বস্তীকে ঠাণ্ডা না করলে 'খাইবার'-এ খাবার সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না। আশ্চর্য, আটশো ব্রিটিশ সোলজার মেশিনগান দিয়ে একটা বস্তীকে সামলাতে পারছে না!"

এর উত্তরে আর্মস্ট্রং বললেন, "স্যার, একটা কথা বলি। সরাসরি আক্রমণ করে কোন লাভ নেই। ওরা গলি-ঘুঁজিতে লুকিয়ে থেকে লড়ে যাচ্ছে। ব্যারিকেড করে আর্মার্ড-কারের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।" তারপর মিঃ ডেন্হাম্কে একটা বোতল এগিয়ে দিতে বলে বললেন, "এই দেখুন স্যার, একটা সাধারণ বোতলের মধ্যে এসিড আর লোহার কুচি দিয়ে কি মারাত্মক বোমা তৈরী করেছে।"

এই কথা বলে মিঃ র‍্যাট্রের দিকে বোতলটা এগিয়ে দিলেন। মিঃ ডেন্হাম্ বললেন, "এটা তো মলোটভ ককটেল-এর ভারতীয় সংস্করণ।" মিঃ রাট্রে মলোটভ ককটেল জিনিসটা কি তা জানতে চাইলেন। মিঃ ডেন্হাম বললেন, "গেল মহাযুদ্ধে রাশিয়ার পার্টিজন্রা জার্মান ফৌজের বিরুদ্ধে মলোটভ ককটেল বোমা ব্যবহার করেছিল।" মিঃ র‍্যাট্রের মনে সন্দেহ জাগলো এই ভেবে যে, এই নৌ-বিদ্রোহের পেছনে রাশিয়ানদের কোন কারসাজি

আছে কিনা। পরে বললেন, "বোতলটা দেশী, কিন্তু বোমা তৈরী করতে শেখাচ্ছে কে? আপনারা জানেন না, রাশিয়ানরা কি বিরাট চক্রান্ত করছে। চীনে কম্যুনিস্টদের মুক্ত এলাকা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ইয়েনানে, মালয়ে, ভিয়েৎনামে, বর্মায়, ইন্দোনেশিয়ায়—সব জায়গায় কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র। আপনারা কি বলতে চান ভারতকে ওরা ছেড়ে দেবে? এশিয়া রাশিয়ানদের খপ্পরে চলে যাচ্ছে।"

এর পরেই তিনি বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারকে ফোনে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যালো, আমি র‍্যাট্‌ট্রে বলছি, কম্যুনিস্ট পার্টির সবক'টা অফিস দখল করা হয়েছে কি? ক'টাকে অ্যারেস্ট করেছেন? কি বললেন? বি. টি. রণদিভে? গা-ঢাকা দিয়েছে? খুঁজুন। বার করুন প্রত্যেককে। ওরাই যে সবচেয়ে এগ্রেসিভ এটা তো বুঝতে পারছেন? আর শুনুন, একটা রাশিয়ান, নাম থি খাই লভস্কি, টাস্ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সে ব্যাটা আজ আমার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়েছে। সেই রেড্ বাস্টার্ডকে গ্রেপ্তার করুন। কি বললেন? ঠিকানা? ঠিকানা আমি জানব কি করে? ওর ঠিকানা আপনার জানবার কথা, আমার নয়।"

তার পরেই তিনি প্রেস-বিজ্ঞপ্তি দেবার জন্য তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডিক্‌টেসন্ দিলেন। ডিক্‌টেসন্ হলো—তিনি হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছেন যে, বোম্বাইয়ে যে কুৎসিত রক্তপাত ও দাঙ্গা চলছে তার পেছনে রুশ কম্যুনিস্ট গুপ্তচরের হাত আছে। সরকার দেশবাসীকে জানাতে চান—ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁরা শীতল মস্তিষ্কে বিবেচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু কিছুতেই এদেশকে তাঁরা সর্ববিধ্বংসী ধর্মদ্বেষী কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে দিতে রাজী নন।

এই আলোচনা এবং প্রেস-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় আমাদের দেশের ব্যাপারে তাঁদের (ব্রিটিশের) দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম এবং কোন্ ধরনের। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, একজন ভারতীয় সামরিক অফিসার, ক্যাপ্‌টেন্ এস্. কে. সেন ঐ আলোচনা-সভায়

মিঃ র‍্যাট্‌ট্রের বাংলোতে উপস্থিত ছিলেন। ওদিকে তিনি আবার গুপ্ত সংস্থারও একজন ক্যুরিয়ার। তাঁর কাছেই এই সব আলোচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে।

মিঃ গডফ্রে-র চাতুর্য সম্বন্ধে রেটিংদের সন্দেহ ছিল না। তখন তাঁর এমন অবস্থা ছিল না যে, রেটিংদের ওপরে আক্রমণ শুরু করতে পারেন। কাজেই চলছিল নিপুণ কৌশলের খেলা। তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন রেটিংদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করতে। জাতীয় নেতাদের সহানুভূতির ওপরে তিনি ভরসা করেছিলেন। কেননা ১৯শে ফেব্রুয়ারি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে চৌপাটির (সমুদ্রতীরে অবস্থিত) এক সাধারণ সভায় রেটিংদের বিষয়ে এমন সব মন্তব্য করেছিলেন যে, রেটিংরা হল একদল উগ্র-মস্তিষ্ক যুবক, যারা অত্যন্ত অশোভনভাবে জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছে এমন সব ব্যাপারে, যাতে তাদের অর্থাৎ রেটিংদের নাক গলাবার কথা নয় (Bunch of young hot-heads messing with things they had no business in)।

মুসলমান, হিন্দু অথবা শিখ নেতারা তখন কন্‌ফারেন্স টেবিলে মত্ত। তাঁদের কাছে রেটিংরা ছিল শূন্যলোক থেকে আসা মূর্খ বা 'Young fools', যারা তাঁদের কাছে নেতৃত্ব আশা করছে। রাজনীতিতে রেটিংরা এমনই অবোধ শিশুর মতো ছিল যে, একটা সাধারণ বাস্তব তথ্য তাদের খেয়ালে আসেনি। পরে অবশ্য সে সত্য তাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হল যে, যে-সব লোক শুধু নিয়মতান্ত্রিক, অহিংসা, অসহযোগ ইত্যাদির ওপরে আস্থা স্থাপন করে বসে আছেন, তাঁরা এসে দেবেন রেটিংদের তথা সমগ্র বিদ্রোহী বা বিপ্লবীদের নেতৃত্ব,—এরূপ আশা পোষণ করাই ভুল। মহাত্মা গান্ধী তখন ছিলেন তাঁর মধ্য-ভারতের আশ্রমে। এই গোলমালের কথা জেনে তিনি একদিন তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় কথাপ্রসঙ্গে বললেন,

"রেটিংরা যদি অসন্তুষ্টই ছিলেন, তবে তাঁরা তো কাজে ইস্তফা দিতে পারতেন (**could have resigned**) !"

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ব্রিটিশ-পার্লামেন্টে শ্রমিক-দলীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লী ঘোষণা করলেন, "রয়েল নেভীর জাহাজগুলো পূর্ণগতিতে বোম্বাইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।" সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর জেনারেল হেড-কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হল, "জল, স্থল এবং বিমান-বাহিনীর শক্তিশালী সৈন্যদল গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্রস্থল বোম্বাই, করাচী এবং পুণা অভিমুখে রওনা হয়েছে।"

ঠিক একটু পরেই অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে মিঃ গডফ্রে-র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বললেন, "সরকারের সমস্ত সশস্ত্র শক্তি নিয়োগ করা হবে এ বিদ্রোহ দমনে,—তাতে সমস্ত নৌ-বহর ধ্বংস করতে হলেও দ্বিধা করা হবে না।" কিন্তু এই সময়েই খবর পাওয়া গেল (গুপ্তপথে) করাচী, বোম্বাই, পুণা, জলন্ধর প্রভৃতি জায়গায় স্থল-বাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর সৈন্যদের ওপর আদেশ করেছে বোম্বাই এবং করাচীতে নৌ-বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য রওনা হতে, তাঁরা তা না করে উলটো ধর্মঘট করে বসলো। বিমান-বাহিনীর কিছু কিছু বিমান পুণা থেকে লোক দেখানর মতো রওনা হয়েছিল বটে, কিন্তু কী এক অদ্ভুতভাবে সব ইঞ্জিনই খারাপ বলে তারা যোধপুরে নেমে পড়ল। স্ট্রাইক্ কমিটির নেতারা আবার জাতীয় নেতাদের আহ্বান জানালেন নৌ-বহরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে। তাঁরা (বিদ্রোহী নেতারা) বললেন, "আমরা ভারতীয় জাতীয় নেতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছি, ব্রিটিশের কাছে নয়।"

এদিকে সংবাদপত্রে প্রকাশ পেল,—কোন কোন বামপন্থী রাজনৈতিক দল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। কংগ্রেস তার

বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রকাশ করল। তখনও রেটিংরা বেরিয়ে আসতে পারছিল 'তলোয়ার' ও পোতাশ্রয়ের ডক্-ইয়ার্ড থেকে। এবারে নৌ-কর্তৃপক্ষ ক্যাসেল্ ব্যারাক্ ও ডক্-ইয়ার্ড বরাবর ব্রিটিশ সৈন্যদের মার্চ করিয়ে দিল। শহরের ব্যবসায় কেন্দ্রের কাছাকাছি এবং অতি নিকটে অবস্থিত এই ডক্-ইয়ার্ড এবং ক্যাসেল্ ব্যারাক্স। ক্যাসেল্ ব্যারাক্সের ঠিক সামনেই টাউন হল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার বিরাটকায় সৌধগুলো। সেদিন সকালে প্রায় পাঁচ হাজার রেটিং ক্যাসেল্ ব্যারাকে ছিল। যারা জাহাজ ব্যারাকে যায়নি তারা ঐ ক্যাসেল্ ব্যারাকেই কাটিয়েছিল রাতটা। স্ট্রাইক্ কমিটির আহ্বানে অনশন ধর্মঘট তখনও চালিয়ে যাচ্ছিল। সকাল প্রায় ন'টা নাগাদ ভারতীয় সৈন্য ক্যাসেল্ ব্যারাকের রেটিংদের ওপরে গোলা-বর্ষণ করল। রেটিংরা ছুটে গেল সংগ্রাম-স্থলে—'Action Station'-এ। বছরের পর বছর ধরে তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল।

ভারতীয় সৈন্যরা (অবশ্য কোন কোন রেজিমেণ্ট), ব্রিটিশ অফিসারদের আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। ভারতীয় সৈন্য দেখে রেটিংরা গুলী চালিয়ে মোকাবিলা করতে চাইল না। তারা লাউডস্পীকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে জানাল,—"ভাইসকল, আমরা কেবল নিজেদের জন্যই এ-যুদ্ধ করছি না, এ-যুদ্ধ করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য। এ-যুদ্ধ তোমাদেরও। ভাইসকল, আমরা তোমাদের ভাই। আমাদের ওপরে গুলী ছোঁড়া বন্ধ করো।"

বন্ধ হলো গুলী ছোঁড়া। এটা ঠিকই যে, ভারতীয় সৈন্যদের বেশি বোঝাবার প্রয়োজন ছিল না। যথার্থ স্থানেই তাদের মনের আনুগত্য ছিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তার পরেই একটি সৈনিক গোপন সঙ্কেত এবং ইশারায় জানিয়ে দিল, তারা ফাঁকা গুলী ছুঁড়েছিল। উল্লাসে ক্যাসেল্ ব্যারাক্সের রেটিংরা ফেটে পড়লো। এর কিছু পরেই ভারতীয় সৈন্যদের মার্চ করিয়ে তাদের নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

বেলা ১১টায় ব্রিটিশ সৈন্য পরবর্তী আক্রমণ শুরু করলো। রেটিংরাও দাঁড়িয়ে গেছে যুদ্ধ করার ভঙ্গীতে। এবারে ক্যাসেল্ ব্যারাক তৈরী হয়ে গেছে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের সম্মুখীন হতে। অহিংসাবাদের ঘটেছিল যে-পরিণতি অনশন ধর্মঘটও লাভ করলো সেই পরিণতি। রেটিংরা এখন দাঁড়ালো তাদের পরিচিত ভূমিতে। তাদের বোধহয় মনে আর কোন দ্বিধা ছিল না—তাই যুদ্ধ করার প্রয়োজনে খাদ্য-গ্রহণ করা স্থির করলো। 'তলোয়ার'-এ কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির নিকট খবর পেল ক্যাসেল্ ব্যারাক আক্রান্ত হয়েছে। সভাপতি মিঃ খান্ বেরিয়ে এলেন নিজে দেখবার জন্যে। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আক্রমণের কাজ বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছে, তখন তিনি স্থির করলেন, কমিটির আস্তানাটি আরও সুবিধাজনক স্থানে 'তলোয়ার' থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তাই ঠিক হল ফ্লাগ্-শিপ 'নর্মদা' হবে সেই আস্তানা। ভারতীয় নৌ-বিভাগের সবচেয়ে আধুনিক স্লুপ 'নর্মদা'। মাত্র ১৯৪১ সালে ব্রিটেনে তৈরী হয়েছিল।

সেইটাই হলো রেটিংদের যুদ্ধ চালানোর হেড-কোয়ার্টার্স। পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজকেই নির্দেশ দেওয়া হলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে (Raise steam and prepare for action stations)। তাদের বলা হলো,—"সমগ্র বোম্বাই শহরের চারধারে যুদ্ধসজ্জায় দাঁড়াতে হতে পারে প্রয়োজনবোধে। আমাদের জাহাজ এবং আমাদের পোতাশ্রয়কে রক্ষা করতেও এর প্রয়োজন হতে পারে।" কিন্তু দুর্ভাগ্য, শত্রুপক্ষ সেই বেতার-সঙ্কেতের নির্দেশটি ধরতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে কর্তৃস্থানীয় লোক এবং কোন কোন রাজনৈতিক নেতা এই খবরকেই রেটিংদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা এই বলে রেটিংদের নামে অপবাদ দিলেন যে, তাঁরা (রেটিংরা) বোম্বাই শহরকে উড়িয়ে দেবার প্ল্যান্ এঁটেছিল (to blown up the city)।

এদিকে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়লো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রেটিংদের অনাহারে রেখে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। তাদের খাবার দিচ্ছে না। এবারে জনসাধারণ ছুটে এল রেটিংদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে। সর্বস্তরের লোক এসে জড়ো হলো সমুদ্রতীরে। খাবারের প্যাকেট কারো হাতে, কারো হাতে খাবার জল-ভরা পাত্র। রেস্টুরেন্টের মালিকরা অনুরোধ জানালো জনগণকে, যতখুশি খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ রেটিংদের দিয়ে আসতে। রাস্তার ভিক্ষুকরা পর্যন্ত ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনে এসে হাজির হলো তাদের সামান্য খাদ্যটুকু তুলে দিতে।

সে এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য! সমস্ত এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা সশস্ত্র টহল দিচ্ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তৈরী হয়ে ছিল একটু তফাতে। যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা যেত এই দৃশ্য। ভারতীয় সৈন্য আগে, পেছনে থাকত ব্রিটিশ সৈন্য। মৃত্যু-শেল ভারতীয়দের বুকে আগে পড়ুক —এই থাকত ওদের প্ল্যান। বোম্বাইয়ের হাজার হাজার জনগণ খাবারের প্যাকেট সাথে এনে সমুদ্র-কূল অবরোধ করে ফেললো। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ঐ সকল খাবারের প্যাকেট জাহাজ থেকে পাঠানো ছোট ছোট নৌকায় তুলে দিতে সাহায্য করছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ অফিসারকে বলতে শোনা গেল,—"ও মাই গড, এ তো বিদ্রোহ!"

কয়েক ঘন্টার মধ্যে 'তলোয়ার'-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে এত খাবারের প্যাকেট এলো যে, রেটিংদের (দেড় হাজার রেটিং) কয়েকদিন ধরে খাবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওখানে আর অন্যান্য জাহাজ ব্যারাক্ মিলিয়ে রেটিং-এর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। করাচীতেও ছিল প্রায় দশ হাজার। তাই খাদ্যের অভাব ছিল সর্বত্র। যা-কিছু খাবার পাওয়া গেল তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তবে, এইভাবে খাদ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে প্রমাণ

হচ্ছে যে, এই বিদ্রোহের পেছনে দেশের সাধারণ লোকের কী অকুণ্ঠ সমর্থন বিদ্যমান।

ওদিকে ডক্-ইয়ার্ড অথবা ক্যাসেল্ ব্যারাকে ব্রিটিশ টমীদের প্রবেশের সমস্ত চেষ্টাই প্রতিহত করা হলো। যে সকল জায়গা থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, জাহাজ থেকে সে সকল স্থানে বিশেষ করে ওয়ার্লিকান্ কামানের গোলা ছোঁড়া হলো। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলী-গোলা চলছিল; মাঝে মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোঁড়া হচ্ছিল। এই সময়েই গডফ্রে সাহেব স্ট্রাইক কমিটির কাছে এক তারবার্তা পাঠালেন। তাতে বললেন, "তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।" এই বার্তা পেয়ে গুলী ছোঁড়ার কাজ বন্ধ করার (cease fire-এর) নির্দেশ দিলেন স্ট্রাইক্ কমিটি। তার পরে সভাপতি মিঃ খান বার্তা পাঠালেন গডফ্রে সাহেবের কাছে এই বলে যে, "আশা করা যায়, আপনার দিক থেকেও কোন আক্রমণ হবে না। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করছি।" দেখা গেল মিঃ গডফ্রে ক্যাসেল্ ব্যারাকে এলেন না। কি যে হলো, ঘটনা কি ঘটলো, তা আর বোঝা গেল না। তবে মনে হয়, রেটিংদের আক্রমণে ইংরাজরা দিশেহারা হয়ে এবং কোন কোন জাতীয় নেতার অনুগ্রহ লাভ করে রেটিংদের জোরালো আক্রমণকে কৌশলে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই ঐভাবে বিদ্রোহী নেতাদের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন মিঃ গডফ্রে। গডফ্রে সাহেবের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হলো!

২২শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১১ টায় F. O. C. R. I. N.-এর বার্তা মিঃ র‍্যাট্‌ট্রে বেতারযোগে ঘোষণা করলেন। অবশেষে তাঁদের (ব্রিটিশের) আকাঙ্ক্ষিত অতিরিক্ত সৈন্যদল এসে গেল,—তারা

আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তিনি বেতারবার্তায় চরম বাণী পড়ে শোনাতে লাগলেন, "আমি গতকাল তোমাদের বলেছিলাম, শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রচুর সৈন্য পাওয়া যাবে। মহামান্য সর্বাধিনায়ক (His Excellency the C-in-C) হুকুম দিয়েছেন, সাদার্ণ কমাণ্ডের জি. ও. সি (G. O. C) যেন বোম্বাইয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রচুর ক্ষমতা সরকারের অধিকারে আছে,—একথা বোঝাবার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন, রয়াল্ এয়ার ফোর্সের (R. A. F.) একঝাঁক বিমানকে পোতাশ্রয়ের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে। আমার সতর্কতার বাণী অনুসারে যদি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করাই স্থির করে থাকো তা হলে উড়িয়ে দাও সাদা অথবা নীল পতাকা, সবাই এসে জড়ো হয়ে দাঁড়াও বোম্বাইয়ের শহরের দিকে মুখ করে ডেকের ওপরে,—পরবর্তী হুকুমের জন্য অপেক্ষা করো।"

যে সময়ে এই তারবার্তার কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন জনসাধারণ রাস্তায় বেরিয়ে এসে টমীদের সঙ্গে লড়াই করছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে ব্যারাকে আটকে রাখা হলো। মেশিনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমীদের ব্যাটেলিয়ান গুলো রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। জনসাধারণের হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন-তেমনভাবে ব্যারিকেড্ তৈরী করে তার পেছনে থেকে পাথর ছুঁড়ছিল। শত শত লোককে গুলী করে ট্যাঙ্কগুলো আর বম্বার্ড-কারগুলো রাস্তা পরিষ্কার করতে পেরেছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারি যা ঘটেছিল তা ভারতের অন্যান্য সাধারণ গণ-অভ্যুত্থানগুলো থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বোম্বাইয়ের খেটে-খাওয়া লোকেরা একসাথে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। যারা কামানের গোলার মুখোমুখি হয়েছিল পাথর নিয়ে, তারা গুলীর আঘাতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কখনও প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু এই বিষয়ে সবাই একমত যে,

বোম্বাইতে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণ হারায়নি। করাচীতেও ঐ একই চিত্র। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল রেটিংদের দিন, আর ২২শে ফেব্রুয়ারি হল বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের দিন।

২২শে ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের উদ্দেশে পরস্পর-বিরোধী আবেদন প্রকাশ হল বিভিন্ন সংবাদপত্রে।

বামপন্থী দলগুলি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সর্ববৃহৎ জাতীয় দলের পক্ষ থেকে সর্দার প্যাটেল বললেন, "কংগ্রেস যথাসম্ভব চেষ্টা করে চলেছে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্য। ঘটনার এই বেদনাদায়ক আবর্তনের জন্য কে দায়ী—কিসে এই বিধ্বংসকারী পরিণতি ঘটলো তা জানা নেই। প্রত্যেক দায়িত্বশীল লোকের প্রথম এবং সমূহ কর্তব্য হলো লক্ষ্য রাখা, যেন শহরটি গোলযোগে নিমজ্জিত না হয় এবং তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া অব্যাহত থাকে। জনসাধারণের পক্ষে সর্বোত্তম কাজ হবে, নিয়মিত তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাওয়া।"

কংগ্রেসের শক্ত মানুষ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ও স্পষ্টবক্তা সর্দার প্যাটেল তাঁর ভাষণে কোথাও সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না। জেল থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা দেখলেন ব্রিটিশের সাথে সমঝোতা করার সুযোগ আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। তাঁর মতে এসব বোকা ছেলেরা (Young fools) ছিল 'চীনা মাটির দোকানের সেই কিংবদন্তীর বলদ'-এর মতো। আমাদের দিক থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিনি যে, ব্রিটিশদের সত্যি সত্যি স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল।

F. O. C. R. I. N.-এর ভারতীয় নৌ-বহর ধ্বংস করার বর্বরোচিত হুমকির পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের নিকট এন. সি. এস্. সি. (নেভাল সেণ্ট্রাল স্ট্রাইক্ কমিটি)-র নিবেদনটিও প্রকাশ করে যাচ্ছিল। তা হলো,—"নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন গুলী ছোঁড়া বন্ধ করতে,—তাঁদের বাধ্য

করুন ভয় দেখানো বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে।”

যে অবস্থায় অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্‌ট্রে রেটিংদের এনে ফেলতে চেয়েছিলেন, সে অবস্থাতেই তারা (রেটিংরা) এসে পড়লো। রেটিংদের সমকক্ষ হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে বসা আর প্রয়োজন হলো না। ততক্ষণে জাতীয় নেতাদের চিন্তাধারার বিষয়ে তিনি (মিঃ র‍্যাট্‌ট্রে) বেশ একটা অভ্রান্ত ধারণা গঠন করে নিয়েছেন।

আমরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলাম, 'তলোয়ার' এবং ক্যাসেল্ ব্যারাকে। সবাইকে বোঝাতে লাগলাম পরিস্থিতি ও সঙ্কটের তাৎপর্য; এবং ঘটনাবলীর চ্যালেঞ্জ বিষয়ে। বাইরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে এবং নৌ-বিদ্রোহীদের আত্মপ্রত্যয় দেখে নৌ-বাহিনীর স্ট্রাইক্ কমিটি প্রস্তাব নিলেন,—“আমাদের ভাইদের রক্ত ঝরছে রাস্তায়। আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি না,—পারি না দেশকে ডুবিয়ে দিতে। যাই-ই ঘটুক না কেন, সর্তহীনভাবে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে না। যা ঘটে ঘটুক।” এর পরে নাবিকরা নির্বাচিত 'আলোচনা সমিতি' (যা তৈরী হয়েছিল নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য) ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হলো।

রেটিংদের অবস্থা তখন শোচনীয়। সাধারণ অসন্তোষকে একত্র করে এক খাতে বইয়ে দিয়ে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হয়েছিল গোপন সংস্থার নির্দেশমতো। চেষ্টা করা হয়েছিল ঐ অসন্তোষকে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে। কিন্তু তাদের পরাজয় হলো। তাদের পরাজয় ঘটলো, যেহেতু সৈন্য সংগঠন করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম তার কার্য-কারণসঙ্গত অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। আমাদের নেতারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে। অথচ জনসাধারণ তাদের ভাগ্য সমর্পণ করে দিয়েছিল নৌ-সেনাদের ওপরে। শত বছরেও যে সুযোগ আসেনি, সে সুযোগ

লাভ করেও আমরা তাকে সদ্ব্যবহার করতে অপরাগ হলাম। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার আচরণ হলো শিশুদের মতো—ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শেষে বড়দের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার মতো। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অভাব ছিল যোগ্যতার, নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে পড়ে থাকার শক্তির, আর অভাব ছিল বিচার-বুদ্ধির এবং অভিজ্ঞতার।

বিদ্রোহকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে হলে নেতৃত্বের যে সব গুণ থাকা দরকার আমাদের নেতাদের তার সব কিছুরই অভাব ছিল। এটা খুবই বাস্তব সত্য। নতুবা 'ক্যাবিনেট্ মিশন'-এর আলোছায়ার মায়ায় দেশের জাতীয় নেতারা মশগুল হলেন ; বিপ্লব ত্বরান্বিত করার মতবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী-দলগুলো হয়ে পড়লেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগলো,—স্বাধীনতা তো এসে গেল। এখন কি আর এইসব রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন আছে ? তার চেয়ে বরং দিল্লীর মস্‌নদের ক্ষমতা লাভের অংশ গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালানো অনেক বেশি প্রয়োজন। নইলে এইসব বিষয় নিয়ে সবাই চিন্তান্বিত থাকবেন কেন ? ফলে, সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা, বিশেষ করে নৌ-বাহিনীর রেটিংদের, স্থল ও বিমান-বাহিনীর যোদ্ধাদের আন্দোলন হলো পরোক্ষে উপেক্ষিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিই হলো, সততা ও নিষ্ঠার বিলুপ্তি, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি চরিতার্থতার নিমিত্ত 'জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে' বলে ক্যামোফ্লাজ-যুক্ত আত্মপ্রচারণার দ্বারা নিম্নস্তরের কার্যাবলী গ্রহণ,—সে যতই নিম্নস্তরের মানবতা-বিরোধী হোক না কেন ; আর মহান দেশপ্রেম হলো উপেক্ষিত। এই পরিবেশের মধ্যেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেখা দিয়েছিল ভারতের মহান নৌ-বিদ্রোহ।

২২শে ফেব্রুয়ারি, রাত একটা। এবারে প্রথম সারিতে এগিয়ে এলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আর দ্বিতীয় সারিতে এসে দাঁড়ালেন ডঃ জি. অধিকারী এবং ডঃ ইউসুফ্। শ্রীযুত পটবর্ধন তখনও আত্মগোপন করে থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু ঐ উপস্থিত নেতাদের ওপরে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। সর্দার প্যাটেল বললেন,—"আপনাদের দাবী-দাওয়া মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা কংগ্রেস করবে। আপনাদের ওপরে যাতে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় কংগ্রেস অবশ্যই তা দেখবে। আপনারা, আমার অনুরোধ, শান্ত থাকুন; আমার ওপরে বিশ্বাস রাখুন। আত্মসমর্পণ করুন।"

বোম্বাইয়ের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে. এম. মুন্‌সী সর্দার প্যাটেলের শক্ত নীতির সমর্থনে এক বিবৃতিতে বললেনঃ "আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে সর্দার প্যাটেল বোম্বাইয়ের মতো মহান শহর ও ভারতবর্ষকে এক ব্যাপক সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেসের নির্দেশ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার দিন আসেনি। তথাকথিত দাঙ্গার প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম কেমন করে করতে হয়, তার সুচিন্তিত ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কংগ্রেসের হাত থেকে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মতলব প্রকাশ পায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টা আপনাআপনি জনতার মধ্য থেকে আসেনি এবং রেটিংদের নালিশ দূর করার উদ্দেশ্যের চেষ্টা থেকেও সৃষ্টি হয়নি। বোম্বাইয়ের পুলিশ সমাজ-বিরোধীদের (?) সঙ্গে সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। বোম্বাইয়ের পুলিশের কর্ম-নিপুণতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারছি না, বোম্বাইয়ের

'পুলিশ অ্যাকট্' অনুযায়ী কেন আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি !"

অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম. এ. জিন্না ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) কলকাতায় একটি বিবৃতি দেনঃ "খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আর. আই. এন. ধর্মঘট বোম্বাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কলকাতা ও করাচীর রেটিংরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। বোম্বাই, করাচী ও কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পাঠে বোঝা যায় যে, নাবিকদের ন্যায়সঙ্গত নালিশ রয়েছে এবং দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। কোন সভ্য সরকারের পক্ষেই তাদের এই মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আর. আই. এন. রেটিংদের ন্যায়সঙ্গত নালিশ দূর করার কাজে আমি অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি নাবিকরা নিয়মতান্ত্রিক, আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন এবং আমাকে যদি সমস্ত তথ্য জানানো হয় তা হলে আমি তাঁদের নালিশ দূর করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর. আই. এন.-এর লোকদের কাছে আমি আবেদন (appeal) জানাচ্ছি ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য—বিশেষ করে মুসলমানদের অনুরোধ করছি ধর্মঘট বন্ধ করতে।"

মিঃ জিন্না আরও জানান যে, ৮ই মার্চ তারিখে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তখন ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে নাবিকদের নালিশ নিয়ে তদ্‌বির করবেন। (ফ্রি প্রেস্ জার্নাল, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।)

২২শে ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেণ্ট শ্রীআর. এস্. রুইকর সংবাদপত্রে নৌ-ধর্মঘটীদের সমর্থনে এক বিবৃতি দেনঃ "রেটিংদের প্রতি জাতি-পক্ষপাতহীন ব্যবহার, ন্যায়সঙ্গত

নালিশের সন্তোষজনক মীমাংসা দাবী করি এবং নাবিকদের দাবীসমূহ যে ন্যায্য ও মডারেট, তাও স্বীকার করি।"

৪ঠা মার্চ তারিখে শ্রীআর. এস্. রুইকর বোম্বাই যান, সেখানে তাঁকে কংগ্রেস-কর্মীরা বিপুলভাবে সংবর্ধনা করেন। উত্তরে শ্রীরুইকর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের শিক্ষার বর্ণনা করেন। নৌ-বিদ্রোহীদের তিনি সমর্থন করেন। অমান্য ও উন্মুক্ত বিদ্রোহ করার জন্য তিনি রেটিংদের উপর দোষ না দিয়ে তাঁদের বাধ্য করেই, প্ররোচনা দিয়েই বিদ্রোহী করে তোলা হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। শহরে নানা ধরনের উৎপাতের জন্য দায়ী গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে শ্রীরুইকর বলেন যে, প্রত্যেক বিপ্লবেই নিম্নস্তরের জনগণই প্রধানত অংশ নিয়ে থাকেন, আর উচ্চশ্রেণীর প্রবক্তারা আরাম-কেদারায় বসে বড় বড় নৈতিক বুলি আউড়িয়ে থাকেন। যাঁরা 'হয় করব নয় মরব' বলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁদের সমালোচনা করা এই সব আরাম-কেদারার রাজনীতিকদের মুখে সাজে না। পেথিক লরেন্স-এর মিশন ভারতীয় জনগণের এই নবজাগরণের পথকে ক্লান্ত ও বিপথগামী করার জন্যই প্রেরিত হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট মুখপত্র 'ডেইলী ওয়ার্কার' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আর. আই. এন. ধর্মঘট সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখা যায়ঃ "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের চাপ ও বিক্ষোভের তরঙ্গগুলি নৌ-বিদ্রোহ তুঙ্গতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

"ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায়, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে এযাবৎ যা কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করেছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর ভেদনীতি তাঁরা লক্ষ্য করেন। ভেদনীতির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত নীতিই দেখতে পান।

"ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ সময়ে মনে রাখা দরকার। এ-হেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ভারতে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে কোন অস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত নয় যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্প্রতি ঘোষিত নীতির যদি পরিবর্তন করা না হয়, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতীয় জনমত কখনই এমন ধরনের সংবিধান-রচয়িতা সংস্থাতে রাজী হতে পারে না, যা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ভারাক্রান্ত থাকবে—বিশেষ করে যদি সেই সংস্থা সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গ দ্বারা অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়। ভারতীয় জনসাধারণ ভারতীয় সংবিধান রচনায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাড়া আর কারো হস্তক্ষেপ আজ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।" (রয়টার, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)

বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য থেকেও নৌ-বিদ্রোহের রূপরেখা বিচার করা যায়। ব্রিটেনের আটটি জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সাতটি আর. আই. এন. নৌ-বিদ্রোহের সংবাদের প্রাধান্য দিয়ে খবর পরিবেশন করেন। আর লেবার-পার্টির মুখপত্র "ডেইলী হেরাল্ড্" খবরটিকে দ্বিতীয় স্থান দেন—তাঁদের বোম্বাইয়ের সংবাদদাতার সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে।

রক্ষণশীল দলের কাগজ, "ডেইলী একসপ্রেস্"-এ এক চমকপ্রদ হেড-লাইন হলো—'Mob out of hand' (জনতা হাতছাড়া), 'পুলিশের গুলীবর্ষণ।'

"ডেইলী মিরর"-এর হেড-লাইন—"বিদ্রোহীদের আসন্ন সর্বনাশ" (Doom threat to mutineers)।

"ডেলী হেরাল্ড্"-এর হেড্-লাইন—"Army peace-man told—Stop Navy Strike !"

"ডেইলী হেরাল্ড্"-এর সংবাদদাতা সাদার্ণ কম্যাণ্ডের কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ জেনারেল্ লকহার্ট-এর বোম্বাই উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য

করেন,—"নৌ-বিদ্রোহ দমন করার জন্য নৌ-সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে একজন আর্মি-অফিসারকে ডাকা বিশেষ ইঙ্গিত ও গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনটি কাগজই সম্পাদকীয়তে নানা মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে 'ডেইলী একসপ্রেস' ও 'ডেইলী মেল' দৃঢ়তার সঙ্গে নৌ-বিদ্রোহ দমন করার সুপারিশ করেন। তৃতীয় কাগজটি, কম্যুনিস্ট পার্টির 'ডেইলী ওয়ার্কার' বলেন, "ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের তরঙ্গের শীর্ষতম তুঙ্গে উপস্থিত।"

নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করলো জাতীয় নেতাদের কাছে। ১৯৪৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১টার পরে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে তাদের স্ট্রাইক্ কমিটির মাধ্যমে দেশের মহান জনগণের উদ্দেশে এক তারবার্তায় আবেদন রাখলেন, "আমাদের জনগণের কাছে আমাদের শেষ কথা, আমাদের জাতীয় জীবনে এই ধর্মঘট এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রথমবার জনগণের এবং সৈনিকগণের শোণিত একত্রে মিলিত হয়ে বয়ে চলেছে এক সাধারণ উদ্দেশ্যে। আমরা সৈনিকরা এই ইতিহাস কখনও ভুলব না। আমাদের ভাই ও ভগ্নিগণ, তোমরাও যে ভুলবে না, তাও আমরা জানি। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক! জয়হিন্দ্!"

এ সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, অতীতের কোন ঘটনার ভিন্নতর নিয়মে অনুরূপভাবে নিষ্পন্ন হওয়া। এটা স্বাভাবিক। অবস্থা এবং ঐতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যে ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে। দেশপ্রেমের প্রেরণা সশস্ত্রভাবে সংহত হয়েছিল একদিন হলদিঘাটের পার্বত্যপ্রদেশে। দেশরক্ষার ও স্বদেশপ্রেমের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং রণক্ষেত্রে তাঁদের পরিণামের চিত্র ইতিহাসের পাতায় আরও আছে। কিন্তু প্রকৃতিতে হলদিঘাট হয়েও তা হুবহু হলদিঘাটের প্রতিচ্ছবি বলতে পারি না।

দেখা গিয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠে ও অস্ত্রবলে বলীয়ান না হলেও বিদ্রোহী মুক্তিযোদ্ধারা বিপুলসংখ্যক ও শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছে। আগেও বলেছি সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সংগ্রামের বড় সহায় নয়, বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের আকূতি অসাধ্য সাধনের ইতিহাস সৃষ্টি করে। দেশপ্রেমের প্রেরণার কথা বাদ দিয়ে যুদ্ধের তথ্য ও জয়-পরাজয়ের সত্যাসত্যের উপর এই বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উত্তর-আফ্রিকার রণাঙ্গনের চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখতে পাই, মুসোলিনীর বিরাট বাহিনী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও বিপক্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ কয়েকটি ব্রিগেডের আক্রমণে খুব সহজেই বিপর্যস্ত ও পরাভূত হয়েছিল। আকারে-প্রকারে বিশাল হলেও মুসোলিনীর বাহিনী যেন কাঠের সেপাই বাহিনীর মতো অপদার্থতার জঞ্জালের নিষ্করুণ চেহারা নিয়ে রণাঙ্গনে ধরাশায়ী হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। সেদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বর্ষা শুরু। মোগলবাহিনী সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর অধীনে বর্ষা শেষের অপেক্ষায় শিবিরে দিন যাপন করছে। বর্ষা শেষ হলেই তারা দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা শিবাজীর দুর্গের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু শায়েস্তা খাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। বর্ষার আকাশে বিদ্যুতের চকিত চমকের মতো শিবাজীর সামান্য-সংখ্যক সেনার আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ নিজেই শায়েস্তা হলেন। তাঁর 'শিবির ছত্রভঙ্গ হলো। আকারে-প্রকারে সামরিক চণ্ডনীতি হিংসাশ্রয়ী না হয়ে পারে না; কিন্তু মোগলবাহিনীর ভীরু হৃদ্‌পিণ্ডে পরাভবের ভয় প্রবল ছিল। শায়েস্তা খাঁর সশস্ত্র সেনানীরা নির্বল হয়ে ভয়ানক পরিণামে পরিণত হলো। নৌ-বিদ্রোহীদেরও আত্মিক বল জেগেছিল, তাই তাদের আত্মিক জয় হয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭। ভারতীয় সৈন্যরা এবারে শান্তি

ফিরিয়ে আনার অনেক রকম চেষ্টা করতে লাগলেন ভোর পাঁচটা থেকে। বেতার-সঙ্কেতে সমস্ত সেণ্টারে সংবাদ দেওয়া হলো যুদ্ধ বন্ধ করতে। স্ট্রাইক্ কমিটির ওপরে সকলের আস্থা ছিল। তাঁরা যখন বলছেন তখন আর দ্বিধা না করে সকলেই যুদ্ধ থামালো। জাতীয় নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। বিদ্রোহীরা তো পূর্বেই তাঁদের আহ্বান করেছিলেন দখলীকৃত সমস্ত নৌ-বহরের দায়িত্ব নিতে। যে কারণেই হোক প্রথমে তাঁরা আসেননি। এখন এসে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন আর তাদের (বিদ্রোহীদের) আনন্দ ধরে না। সবাই তখন আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছেন। মিষ্টি এনে বিতরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। সকলে মিলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল, স্ট্রাইক্ কমিটির সভাপতি মিঃ এম. এস্. খানকে কাঁধে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বইছে। আজ যে আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে!

কিন্তু হায়, ভারতমাতা বোধহয় শৃঙ্খলমুক্ত হতে চাইলেন না। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ দেখা গেল, ছোট ছোট কতকগুলো যুদ্ধ-জাহাজ গোরা সৈন্য বোঝাই করে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলতে লাগলো। ঐ জাহাজগুলোতেও শান্তির পতাকা উড্ডীন ছিল। ব্রিটিশের রণচাতুর্য ও সাংগঠনিক ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা যায় না বা অবজ্ঞা করারও উপায় নেই। বিদ্রোহীদের এই আকস্মিক আঘাতের প্রত্যাঘাত হানতে তাঁরা বদ্ধপরিকর,—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অত সহজে পরাজয় স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করবে—তা অসম্ভবই শুধু নয়, অচিন্তনীয়ও। স্বাধীনতাকামী মানুষকে পদদলিত করে প্রভুত্বের অঙ্গীকারে ধ্বংসের রাজনীতিতে তাঁরা বণিকের ছদ্মবেশে দেশে দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। বিপ্লবীবাহিনার বিজয়-আমেজের অবকাশে এক অসতর্ক মুহূর্তে তাই তারা আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে বিদ্রোহী জাহাজ-

গুলোর দিকে কামান ও মেশিনগানের অগ্নিগর্ভ মুখ খুলেছে। চ্যালেঞ্জের বজ্রনির্ঘোষে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে আসছে। প্রথমে ভুল করে সকলে মনে করলো দূরে যে-সকল আমাদের সমসাথী বিদ্রোহী জাহাজ ছিল তারাই এবারে শান্তির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তীরের দিকের সকলেই তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল। হ্যাঁ, তারা বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে ঐ সাদর সম্ভাষণ-গ্রহণকারী জাহাজগুলো প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো কামানের গোলা আর বড় বড় ম্যাসকেট্রির অজস্র গুলীর দ্বারা।

সবাই তো হতবাক, একি! নেতাদের কথার মূল্য কোথায়? তবে কি, তবে কি,—তাঁরা (নেতারা) বেকায়দায় পড়েছেন? আশ্চর্য, এই বিপদের সময়ে কোন নেতাই এলেন না। হয় তো বা তাঁরা ফলস্ পজিশনে পড়ে থাকবেন! বিদ্রোহীরা আবার বিষাদে মগ্ন হলো। কোন নেতাই এলেন না!

মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো তাদের পূর্ব মোহকে কাটাতে। আবার তারা গেল কামান-বন্দুকের কাছে। আবার ধরলো দূরে সরানো অস্ত্রগুলো,—ভাঙা হাট জোড়া লাগাতে। কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদের দেড়শ' জন মারা গেলেন। মিঃ মদন সিং ঝড়ের বেগে 'খাইবার' জাহাজের বেতার-যন্ত্রের কাছে ছুটে গিয়ে সর্বত্র বেতার-সঙ্কেতে আবার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, "পেছন দিয়ে অতর্কিতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমাদের আক্রমণ করেছে। ওদের ক্ষমা নেই। শান্তির পতাকা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রতিটি গোরা সৈন্যকে খতম করার সঙ্কল্প না'ও। ডু-অর-ডাই!"

তারপরে তিনি একদিকে দৃঢ়হস্তে 'খাইবার'-এর দূরপাল্লার বড় কামানের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে চার্জ দিয়ে ঘন ঘন কামান দাগাতে থাকেন, থ্রী ডিগ্রাস অব রেঞ্জ ওয়ান জিরো টু অট্-অট্-অট্

থ্রী-রেড-স্যালভো···, আবার মাইক্রোফোনে—লাউডস্পীকারে দেশের জনগণের উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে আবেদন রাখেন,—"Oh my beloved countrymen ! See our national leaders. They are nothing but the traitors of our motherland ; see them—see them—see them."

এরই মধ্যে বেতারে খবর পেয়ে 'কাথিয়াড়' জাহাজ (করভেট্ 'কাথিয়াড়'), যে গভীর সমুদ্রে অবস্থান করছিল, তীরের দিকে এগিয়ে এলো। বেতার-সঙ্কেতে তার কাছে ধরা পড়লো এই আক্রমণের সংবাদ। একঘণ্টার মধ্যে ঐ জাহাজের রেটিংরা জাহাজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলো। বন্দরের কাছাকাছি তারা পৌঁছলে বোম্বাইয়ের ফ্লাগ্ অফিসার হুকুম দিলেন প্রবেশপথে অবস্থিত লাইট হাউসের পনের মাইল দূরে জাহাজকে নোঙ্গর করতে। রেটিংরা ইংরাজ ক্যাপ্টেনকে হুকুম দিল বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেনের অন্য কোন উপায় ছিল না এগিয়ে যাওয়া ছাড়া। 'কাথিয়াড়' বন্দরের দিকে এগিয়ে এলে রয়েল নেভীর ক্রুজার 'গ্লাস্‌গো' চেপে এলো তার ওপরে। ছোট্ট জাহাজ তার ক্ষুদে বারো পাউণ্ডের কামান 'গ্লাস্‌গো'-র দিকে উঁচিয়ে তুলে চলে গেল পার হয়ে। ক্রুজার 'গ্লাস্‌গো' আঘাত না করে সম্মান দেখালো ক্ষুদে জাহাজ 'কাথিয়াড়'-এর সাহসকে। সে কাছে এসে বিদ্রোহী ভাইদের সাহায্যের জন্য একটু পেছন থেকে গোরা সৈন্যদের ওপরে কামান দাগিয়ে আঘাত করতে থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেও বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। গোলা-বারুদ-রসদের অভাব তো আছেই। তার ওপরে ছিল খাদ্যের অভাব। ওরা এমনিতেই দু'-একদিন ধরে খাদ্য পাচ্ছিল না। তবুও যেটুকু মিলিত শক্তি পেয়েছিল তা দ্বারা বিদ্রোহীরা আবার নতুন করে দেড় হাজার গোরা সৈন্যকে ভবলীলা সাঙ্গ করে আরব সাগরের গভীর

জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে নিয়তির খেলায় বিদ্রোহীরা সেই ঘৃণিত ব্রিটিশ-শক্তির নিকটেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর আশার প্রদীপ নিভে গেল আরব সাগরের বিষাক্ত হাওয়ায়। আবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, যে বিদ্রোহের দীপশিখা জ্বেলেছিল 'তলোয়ার', তার বীরত্বের ও দেশ-প্রেমের নেতৃত্ব দিয়েছিল 'খাইবার'। এরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

এর পরের ঘটনা আরও মর্মান্তিক। ব্রিটিশ তার জিঘাংসা চরিতার্থ করলো 'কোর্ট মার্শাল'-এর আইনে। বহুশ্রুত 'Silent Service' আবার ২৩শে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যে থেকেই মৌন হয়ে গেল। এক লোহার পরদা শক্ত করে এঁটে দেওয়া হলো আর. আই. এন.-এর ওপরে। কেউ কখনও জানতেও পারেনি কত হাজার বিদ্রোহীকে কারারুদ্ধ করা হলো, কত নাবিককে ডুবিয়ে মারলো; আর কত গুলী করে হত্যা করা হলো! এমনকি রেটিংরাও জানতে পারেনি একে অন্যের ভাগ্যে কি ঘটেছিল।

গোপন পথে খবর পেলাম, বিদ্রোহের প্রধান নেতাদ্বয়কে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। মিঃ এম. এস্. খানকে এক মণ ওজনের দু'টো পাথর দু'পায়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় আরব সাগরের মধ্যখানে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারা হলো; আর মিঃ মদন সিংকে গুলী করে হত্যা করা হলো। সকলেরই শাস্তি হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে। তা ছাড়া সাড়ে চার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মুলতান মিলিটারী জেলে পাঠানো হলো তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করতে।

এই সকল মর্মান্তিক খবর জেনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত আঁতকে উঠে বলেছিলেনঃ "আমি জানতে পেরেছি, কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ-এর বেতার-বার্তার ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুকুম চালু

হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সত্যি এমন ধরনের দেওয়া হচ্ছে, যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে (Terrorisation, not merely victimisation) ।"

আমাদের জাহাজগুলোর অদৃষ্টও এর চেয়ে আর ভালো ছিল না। 'তলোয়ারে' আর সিগন্যাল্ স্কুল বলে কিছু রইলো না। তার নামটা মুছে গেল। নৌ-বিভাগের খাতা থেকে ক্যাসাল্ ব্যারাক্-এর নামটাও বাদ দেওয়া হলো। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরে নৌ-বিভাগের বখরা হিসাবে পাকিস্তান পেল 'নর্মদা'। আমাদের অধিকাংশ বন্ধুদের মত আমার কাছেও হারিয়ে গেল 'হিন্দুস্থান' এবং অন্যান্য জাহাজের গতিপথ। এই জাহাজগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নৌ-অভ্যুত্থানে।

এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বোম্বাই বা বোম্বাইয়ের বাইরে, সমুদ্রতীরে বা সমুদ্রে—সব জায়গা থেকেই সাড়া দিয়েছিল রেটিংরা এন. সি. এস্. সি.-র ডাকে। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান-কল্পে তাদের চাকচিক্যহীন সরল এবং স্বার্থহীন প্রচেষ্টা একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য জনগণকে বিচলিত করেছিল। সর্বত্রই রেটিংরা তুলে ধরেছিল কংগ্রেস-লীগ-কম্যুনিস্টের একত্রিত পতাকা। ব্যারিকেডের পেছনে ছিল যে-সব জনতা, তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো এই জাতীয় একতাবোধের আকাঙ্ক্ষা। ভারত উপমহাদেশে শেষবারের মতো তারাও পতাকাগুলো একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলছিল। রেটিংরা যদি আত্মসমর্পণ না করত, তাহলে আরও ভয়ঙ্কর রক্তপাত হতো। বহু সম্পত্তির আরও ক্ষতি হতো।

কিন্তু ভারত বিভাগের প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতার ছ' মাস বাদে যে বিভীষিকা, যে বিকৃতি এসে গ্রাস করলো ভারতকে, তার তুলনায় এই ক্ষতি ও মৃত্যু হতো নেহাৎই নগণ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি আত্মসমর্পণ না করতাম, তাহলে জাতীয় আন্দোলন হয়তো অন্য কোন পথে বয়ে যেত। ফলে খণ্ডিত ভারত কার্য-পরিকল্পনা

এড়ানো যেত। ব্রিটিশ ভারত থেকে সরে যাবার প্রাক্কালে এই উপমহাদেশে যে বিপর্যয় ঘটালো, তার জন্য যে-সব নেতা দায়ী ছিলেন এই বিরাট ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে হয়তো তাঁদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের নেতার আবির্ভাব হতো।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্য ডঃ জি. অধিকারী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিলেন ঃ

"বোম্বাইয়ের শ্রমিক ও নাগরিকেরা আর. আই. এন.-এর নাবিকদের প্রতি এবং তাঁদের দেশাত্মবোধক দাবীসমূহের প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

"উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ আর. আই. এন. ধর্মঘটীদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেনি এবং তাদের নৌ-বাহিনীসহ ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। গতকাল ধর্মঘটীদের সমর্থক হাজার হাজার নাবিকের ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করতে দ্বিধা করেনি সেই সাম্রাজ্যবাদ।

"ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আর্মার্ড-কার-এ রাস্তায় রাস্তায় টহল দেয় এবং জনতার ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে। জনতা যেখানে ঘনসন্নিবদ্ধ হয়, কোনপ্রকার হুঁশিয়ারী না দিয়েই গোরা সৈন্যরা সেখানে গুলীবর্ষণ করে। প্যারেলের শ্রমিক-অঞ্চলে মেয়ে ও পুরুষের ওপরে এভাবেই গুলী করা হয়। প্যারেলের মহিলা সঙ্ঘের কমরেড কমলা ডোণ্ডে নিহতদের মধ্যে একজন।

"ব্রেন্‌গান, ট্যাঙ্ক ও বম্বারের সাহায্যে ভারতীয়দের ভয় দেখাবার দিন চলে গেছে। আমাদের এই শহরে যদি শক্তি-মদমত্ত সাম্রাজ্যবাদ মনে করে যে, সপ্তাহ-ব্যাপী 'জালিয়ান-ওয়ালাবাগ' সৃষ্টি করে নাগরিকদের দমন করা যাবে, তবে তাঁরা ভুল করছেন। এই রক্তস্নান আমাদের মধ্যে ঐক্যের সিমেণ্টকে

আরও শক্ত করবে এবং 'এই সন্ত্রাসের রাজ্যকে দূর করার' প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ়তর করবে।"

বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় রাজকীয় বিমান-বাহিনীতেই প্রথমে ধর্মঘট সুরু হয়। তার পূর্বে ব্রিটিশের খাস্ রয়েল এয়ার ফোর্সেও ধর্মঘট হয়েছিল। এ-কথাও ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করেন যে, ভারতীয় নৌ-বহরে ধর্মঘটের প্রেরণা আর. এ. এফ. এবং আর. আই. এ. এফ. থেকে এসেছিল। এ স্বীকৃতির তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব কত সুদূরপ্রসারী হতে পারত যদি এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত আপোষহীন বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হতো। ভারতীয় বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আবদ্ধ ধারাকে হয়তো মুক্ত করে দিতে পারত এবং ব্রিটিশ বাহিনীর কাছ থেকেও কোন দূরূহ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হতো। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈনিকেরা তো নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে পড়েছিল। এমন কি গুর্খা-বাহিনীতে স্থানে স্থানে ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া বোম্বাই, কলকাতা, করাচী প্রভৃতি শহরগুলোতে বিদ্রোহীদের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন এবং আহত ও নিহত হয়েছিলেন হাজার হাজার লোক।

এই পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মুখে উপস্থিত হয়েই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী সাহেব তো পার্লামেণ্টে ঘোষণাই করে দেন যে, ভারতকে পরাধীন রাখতে হলে ব্রিটিশবাহিনীকে নূতন করে ভারতকে দখল করতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নওজোয়ানের দরকার হবে,—আজকের ব্রিটিশ নওজোয়ান আর সে ধরনের অভিযানে যোগ দেবে না।

২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'—"প্রাচ্য দেশে বিদ্রোহ" (**Revolt in the East**) শিরোনামায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাতে বলেন: "মিঃ এট্‌লীর স্বাধীনতা

ও ন্যায়ের উপর প্রতিশ্রুত সরকার ভারতে বিশৃঙ্খলা দমন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে :আনতে পেরেছেন বলে জয়ী অথবা আত্মসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণগুলো দূর করতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতেই অশ্বেতকায় জাতিসমূহ গভীর ও বিস্তৃত অসন্তোষের সমুদ্রে বিক্ষোভের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে। এবং তাদের সংখ্যা সমগ্র মানবজাতির অর্ধেকের কম নয়। আজ আমাদের এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে, অশ্বেতকায়দের ওপরে শ্বেতকায়দের সাম্রাজ্য শাসনের অবসান হতে চলেছে।

'আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা' ও 'মানবাধিকারের সনদ' (Bill of rights), এখনও তার কাজ করে চলেছে। পরাধীন জাতিসমূহ আজ তাদের সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে—এ-কথা স্পষ্ট। এই সত্যকে প্রাক্তন মানবজাতিদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। ফিলিপাইনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই সত্যকে স্বীকার করে সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন।"

মস্কোর 'রেডফ্লিট্' নামক কাগজে এই নৌ-বিদ্রোহ সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৪৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম মন্তব্য প্রকাশ করে। এই কাগজে এম. মিখিলভ্ ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধে বলেনঃ "নাবিকদের বিদ্রোহ জনসমর্থিত। বর্তমান ভারতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, নৌ-বিদ্রোহ তার একটি প্রকাশ মাত্র। অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ—জনসাধারণ নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়িত। কৃষিতে চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের সর্বত্র যে অনির্বাণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাতে জনগনের স্বাধীনতা স্পৃহা কতটা তীব্র হয়েছে তাই বোঝা যায়।"
—রয়টার।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, মহাত্মা গান্ধী পুণা থেকে এক বিবৃতিতে বললেন ঃ

"অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। নৌ-বাহিনীতে বর্তমানে এই যে বিদ্রোহ চলেছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটছে, তাকে কোনমতেই অহিংসা বলা যায় না। যখনই কাউকে জোর করে 'জয়হিন্দ' বলানো হয়, অথবা অন্য যে কোন জনপ্রিয় শ্লোগান বলতে বাধ্য করা হয়, লক্ষ-কোটি জনসাধারণের স্বরাজ বলতে যা বোঝায় তার কবর সৃষ্টি করার পক্ষে সেগুলি সবই মর্মান্তিক আঘাত হয়ে ওঠে। গীর্জা ধ্বংস করা অথবা ঐ জাতীয় কোন কাজই কংগ্রেস সমর্থিত স্বরাজের পথ নয়। ট্রাম-কার জ্বালানো, সম্পত্তি ধ্বংস করা, ইউরোপীয়দের অপমানিত অথবা আহত করা, আমার সমর্থিত অহিংসা তো দূরের কথা, কংগ্রেস-সমর্থিত অহিংসাও সেটা নয়। এই সংগ্রামের সকল পরিচিত ও অপরিচিত নেতাদের কাছে এই বিবেচনাহীন হিংসার উন্মাদনার পরিণাম সম্বন্ধে আমি ভাবতে অনুরোধ করি এবং এই পথ থেকে বিরত হতে বলি। পৃথিবীর লোকেরা যেন এ-কথা না বোঝেন যে, কংগ্রেসের ভারতবর্ষ মুখে অহিংসার পথে স্বরাজ-সাধনার কথা বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে চরম পরাক্ষার সময়ে তারা অন্য পথ নেয়। আমি ইচ্ছা করে বিবেচনাহীন কথাটা ব্যবহার করেছি। কেননা, বিচার ও বিবেচনাসম্মত সহিংস পথও একটা আছে।

"আমি আজ যে সহিংস কার্যকলাপ দেখছি তা সত্যিই বিচার-বিবেচনাহীন। যদি নৌ-বাহিনীর সৈনিকরা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের পথ গৌরবময়, পুরুষোচিত ও সমবেতভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রত্যেকের পক্ষেই এ-পথ সব সময়েই প্রযোজ্য। যদি কারও মনে হয় যে, চাকরির অবস্থা ও ব্যবস্থা কারও পক্ষে অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে

অপমানজনক, তবে তিনি সে-কাজে ইস্তফা দেবেন না কেন? এ জাতীয় কর্মপন্থাকে আমি নাম দিয়েছি অহিংস-অসহযোগিতা। কিন্তু নাবিকরা তাঁদের কাজের বর্তমান বিদ্রোহাত্মক কাজের দ্বারা ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করছেন।

"হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসামূলক কার্যকলাপের জন্য এই যে 'মিলন' তা অশুভ এবং হয়তো ঐ পথের ভবিষ্যৎ নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য প্রস্তুতি বলে পরিণতি লাভ করতে পারে,—দেশ এবং পৃথিবীর পক্ষে যা হবে খুবই ক্ষতিকারক।

"ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের হৃদয়ে লুক্কায়িত তিক্ত অসন্তোষের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ যেন সেই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তটিকে কোন কারণে বিলম্বিত না করে। এ বিক্ষোভের শক্তি সীমাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ব্যবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়। এমন কি তা দুষ্টবুদ্ধিজাত হয়েও যেতে পারে, যদি দেশকে অথবা তার একটি বৃহৎ অংশকে আবার দাবিয়ে দেওয়ার পক্ষে একটা অছিলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ এই দেশ বা জনসাধারণ আজ বহুদিন পরপদানত।"

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। মহাত্মা গান্ধী পুণার 'নেচার কিওর' হাসপাতাল থেকে যে বিবৃতি দেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে দু'টি বিষয় গুরুত্ব লাভ করে। প্রথমত, নৌ-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত, ১৯৪২ সালের আগস্ট-বিপ্লবের সময় কংগ্রেসের মধ্যেই যে নবীন নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়,—অরুণা আসফ আলী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, অশোক মেহতা—এঁরা যার

প্রবক্তা-রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড ও গান্ধী-নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় সে সম্বন্ধেও গান্ধীজীর বিচারের কিছু ইঙ্গিত এই বিবৃতিতে আছে। বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যে সেই সময়ে বিদ্রোহী নেত্রী হিসাবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী। তিনি আবার পরোক্ষে সেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ভারতে সমগ্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে। তাই নৌ-বিদ্রোহীরা অনেক কিছু আশা করেছিলেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর নেতৃত্বের কাছ থেকে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিবৃতির মধ্যে অরুণা আসফ আলীকে জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী বিকল্প-নেতৃত্ব সম্বন্ধেই পরোক্ষভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই রূপ ঃ

"সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ঘটনার উপরে আমার বিবৃতির বিরোধিতা করে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। নিজের ঔরসজাত না হলেও, আমি তাঁকে আমার কন্যা বলে মনে করি, যদিও সে কন্যা বিদ্রোহী। সাধারণ অবস্থায় তাঁর প্রতিবাদে আমি কোন প্রতিবাদই করতাম না। কিন্তু তিনি নিজেকে ছাড়াও, যেহেতু আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের প্রতিনিধি-স্থানীয়া, সেই হেতু আমাকে প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিতে হলো।

"তাঁর আত্মগোপনকারী অবস্থায় কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি তাঁর সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও জলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা করি, কিন্তু প্রশংসা সেই পর্যন্তই। তাঁর আত্মগোপনকারী জীবন আমি পছন্দ করি না। আত্মগোপনকারী কার্যকলাপও আমি পছন্দ করি না।

"আমি জানি লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। লক্ষ-কোটি লোকের আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয় না। কিছু কিছু লোক আত্মগোপন করে গোপন নির্দেশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ-

লোককে তাদের স্বরাজ আনয়ন করে দিতে পারেন, এমন ধরনের আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু এ কি ঝিনুক দিয়ে খাওয়াবার মতো নয়? খোলা চ্যালেঞ্জ, প্রকাশ্য কার্যকলাপই সকলে অনুসরণ করতে পারে। সত্যিকার স্বরাজ সকলেরই অনুভব করতে হবে—পুরুষ, নারী ও শিশু—সকলকে। সে জাতায় সার্থকতার জন্য পরিশ্রম করাই হলো সত্যিকার বিপ্লব।

"পৃথিবীর সকল নির্যাতিত জাতিদের সামনে ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত। কেননা, এই ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত অস্ত্রহীন অহিংস ব্যাপক প্রচেষ্টা, যা সকলের কাছেই আত্মদান দাবী করে, অথচ, যারা ক্ষমতাশীল তাদের অনিষ্টকর এমন কিছু দাবী করে না। ভারতের লক্ষ-কোটি লোকের আজ এমন ধরনের জাগরণ হতো না, যদি না, এই ধরনের উন্মুক্ত অস্ত্রহীন সংগ্রাম প্রচলন করা যেত। এই পথে যেখানেই এবং যখনই বিচ্যুতি ঘটেছে তখনই এই ক্রমবিকাশী বিপ্লবের (Evolutionary Revolution) গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছে।

"১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর পাঠ এ-বীরাঙ্গনা মহিলা যেভাবে নেন আমি সেভাবে নিইনি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এ-সংবাদ শুভ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ কেউ অথবা অনেকেই হিংসার পথ নিয়েছিল, এটা ভাল সংবাদ নয়। শ্রীকিশোরীলাল মসরুওয়ালা, কাকাসাহেব এবং আরও কেউ কেউ সাময়িক অধৈর্য উৎসাহে অহিংসার ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতেও কোন ভিন্ন যুক্তি সৃষ্টি করে না। তাঁরা যে এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতেও এ-কথাই প্রমাণ হয় যে, অহিংসা একটি অত্যন্ত লাজুক বা delicate হাতিয়ার। কারও উপরে কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে আমি এই উপমাটি দিইনি—যে যা ভাল বুঝেছেন সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন। সংঘবদ্ধ হিংসার তাণ্ডবমূর্তির সামনে

মাথা নত করে চলা কাপুরুষতারই নামান্তর। আবার, ১৯৪২ সালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার বিচার ও বিশ্লেষণ প্রকাশে দ্বিধা করাও দুর্বলতা ও অন্যায়।

"অরুণা হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়মতান্ত্রিক মোর্চায় মিলিত করার চেয়ে লড়াই-এর ব্যারিকেডে মিলিত করার পক্ষপাতি। সহিংস সংগ্রামের শাস্ত্রেও এ-ধরনের চিন্তা ভুল। ব্যারিকেডে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন সত্যনিষ্ঠ হলেও নিয়মতান্ত্রিক (**constitutional**) মোর্চায়ও এ-মিলনের প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সৈনিকরা সব সময়ই ব্যারিকেডে বাস করে না। তারা নিশ্চয়ই আত্মহত্যাও করে না। ব্যারিকেড-জীবনের পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক মোর্চায়ও উপস্থিত হতে হয়; এই মোর্চাটিও তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু নয়।

"ব্রিটিশের বর্তমান ঘোষণাগুলিকে অবিশ্বাস করা এবং আগে থেকেই ঝগড়া সৃষ্টি করা মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। তাঁদের তরফ থেকে যে সরকারী ডেপুটেশন আসছে, তা কি ভারতের মতো একটি বৃহৎ দেশকে প্রতারিত করার জন্য—এইরূপ চিন্তা বীরোচিত ও বীরাঙ্গনাচিত নয়।

"একটু অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হতো! যে সরকারী প্রতিনিধিদল আসছেন তাতে ব্রিটিশ ঘোষণার উপর বিশ্বাসযোগ্য কিছু তাঁরা দিতে পারছেন না—সেটা শেষবারের মতো প্রমাণিতই হোক না। আমাদেরই দেশ ওদের বিশ্বাস করে লাভবান হবে। প্রতারিতের নির্ভুল অভিব্যক্তিতে শেষ পর্যন্ত প্রতারকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"ঘটনার মুখোমুখি হই না কেন? যে মিশনটি আসছেন তাঁরা নিজেদের ভারতের বন্ধু বলেই ঘোষণা করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারটি তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই বের করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্যাটি সত্যিই জটিল, হয়তো যে কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের পক্ষে জটিলতম। এমনও হতে পারে, মিশন

হয়তো এসে এই জটিল সমস্যাটিকে একটি সমাধানহীন ধাঁধাতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাতে তাঁদের পক্ষে ক্ষতিই হবে। যদি তাঁদের উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে এবং তাঁদেরই তৈরী সমস্যাজাল থেকে তাঁরা নিজেরা মুক্ত হতে চান, তবে সে-পথ মিলবে বলে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশকেও তো এই খেলাতে ন্যায্য অংশ নিতে হবে। যদি তা করে তবে তাঁকেও কোন কালের জন্য হলেও ব্যারিকেড ফেলে আসতে হবে। আমি অরুণা ও তাঁর বন্ধুদের কাছে আবেদন করি, তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আত্মাদানের ভিতর দিয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা যেন বিজ্ঞজনোচিতভাবে ব্যবহার করেন।

"সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মতো রেটিংরা যে আত্মসমর্পণ করেছেন এ একটি বড় স্বস্তির খবর। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। যতদূর আমি দেখতে পাই বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশটি কখনই সতুপদেশ হয়নি। যদি কল্পিত অথবা সত্য নালিশের প্রতিবাদে সে বিদ্রোহ ঘটে থাকে, তার পূর্বে তাঁদেরই পছন্দমতো রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।

"যদি তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে তাঁদের ভুলটাও আরও বেশি বা দ্বিগুণ। একটি সুসংগঠিত বৈপ্লবিক দলের নেতৃত্ব ও ডাক ছাড়া তাঁদের তা করা উচিত হয়নি। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন যে, একমাত্র তাঁদের শক্তির জোরেই তাঁরা ভারতবর্ষকে বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে দিতে পারবেন তবে তাঁদের চিন্তাহীনতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

"অরুণা ঠিকই বলেছেন যে, এই সংগ্রামী নাবিকরা যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। কিন্তু এ-সাহস নির্বোধ দুঃসাহসে পরিণত হয়, যদি তা সময়োচিত না হয় এবং এর পরিণামে আত্মঘাতী হতে হয়।

"অরুণা দাবী করতে পারেন যে, জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার তাত্ত্বিক যুক্তিযুক্ততায় আগ্রহী নয়। কিন্তু আমি বলি, মুক্তির পথ হিংসা অথবা অহিংসার পথে আছে কিনা সে প্রশ্ন জনসাধারণের জানা আছে। জনসাধারণ অবশ্য এযাবৎ অহিংসার পথেই অগ্রসর হয়েছে, যদিও অসম্পূর্ণভাবে আংশিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে। অরুণা ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের বারে বারে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, যুগ যুগান্তের নিদ্রা থেকে ভারতবর্ষকে জাগরণের পথে আনতে, অস্পষ্ট হলেও স্বরাজের জন্য একটি ব্যাপকতম আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে, অহিংসার পথ তাঁদের কতটা কি করেছে। আমার জানা আছে সেখানে প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলবে।"

পূর্বেই বলেছি নৌ-বিদ্রোহের দায়িত্ব এড়িয়ে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট তার পাঠালেন। শ্রীমতী আসফ আলী নৌ-ধর্মঘটের বিস্ফোরক পরিণতির মুখে বোম্বাই থেকে দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুর কাছে এক জরুরী তারবার্তা পাঠালেন—"নৌ-ধর্মঘট চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, অবস্থা ভয়ানক পরিণামের দিকে, চূড়ান্ত হেস্তনেস্তর দিকে অগ্রসর, একমাত্র আপনিই অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারেন এবং আসন্ন ট্রাজেডি থেকে রক্ষা করতে পারেন; এই মুহূর্তে আপনাকে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হবার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করি।"

অথচ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁর জঙ্গী ভূমিকার জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন। কারো কাছে তিনি ছিলেন সেই ঐতিহাসিক কাহিনীর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর মতো। রেটিংদের দায়িত্ব নিতে না পেরে তিনি তাদের বললেন, 'শান্ত থাকো (Remain calm)', আর পণ্ডিতজীকে বললেন, 'আসন্ন ট্রাজেডী থেকে রক্ষা করুন।' সত্যিই তাঁর করুণ ট্রাজেডী!

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে প্রায় দু'লক্ষ লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল,—বোম্বাই শহরে আর. আই. এন.-এর রেটিংদের প্রতি সহানুভূতির জন্য হরতাল করা উচিত কিনা! এই প্রশ্ন শুনে পণ্ডিত নেহরু হঠাৎ রেগে উঠে বললেন,—"আর. আই. এন.-এর সেণ্ট্রাল স্ট্রাইক্ কমিটির এ-ধরনের ধর্মঘট করার পক্ষে আবেদন করার কোন অধিকার নেই। আমি এ-ধরনের কার্যকলাপ সহ্য করব না। এই পনেরটি লোক, তাদের আমি যতই পছন্দ করি না কেন তারা বোম্বাই অথবা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে কী জানে? বোম্বাইয়ের সকলের মাথার ওপর দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে অগ্রাহ্য করে কোন্ অধিকারে তারা এই হরতালের আবেদন জানালো? তাদের উচিত ছিল, এই ত্রিশ লক্ষ নাগরিকদের আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকা এবং নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করা। একমাত্র কংগ্রেস অথবা লীগ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী।"

পণ্ডিতজী বোধহয় জানতেন না যে, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ-সহ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত গোপন সংস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল নৌ-বিদ্রোহ এবং সমগ্র ভারতের বিদ্রোহ-তরঙ্গ। এমন কি শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইও ঐ কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার একজন সদস্য ছিলেন। যদিও তিনি ভিতরে থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকতার কাজই করেছেন। তাঁর বিবৃতির মধ্যেই তা ধরা পড়বে। এ সমস্ত ঘটনা কি পণ্ডিতজী জানতেন না? অবশ্য পণ্ডিত নেহরু চিরদিনই নরম-গরম সুবক্তা হিসাবে পরিচিত। ঐ একই দিনে তিনি আবার বলেছিলেন: "India today is a volcano of 400 million human beings, who refused to be ignored in the world." (Pt. Nehru at Chowpatty meeting.)

ঐ ২৬শে তারিখ পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই আসেন; চৌপট্টির জনসমাবেশে তিনি একই সাথে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও তাঁর নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নি-বর্ষণ করেন এবং অপরদিকে ধর্মঘটী নাবিকদেরও নানা প্রকার ধমক দিতে থাকেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইতেই ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই সব ব্যাপার জানতেন। কেন না, বিদ্রোহী নাবিকরা এবং গোপন সংস্থার সদস্যরা বিভিন্ন সূত্রে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চলছিলেন। সর্দার প্যাটেল অবশ্য বরাবরই এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন। ধর্মঘটীদের বরাবরই ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ (বিনাসর্তে) করতে বলেছিলেন। বিদ্রোহী নাবিকদের পক্ষে বোম্বাই শহরের শ্রমিক ও জনসাধারণের হরতাল, বিক্ষোভ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি সঙ্কোচ না রেখে নিন্দা করেছেন, তার মানে তাঁর মধ্যে কোন 'কিন্তু' বা 'দ্বিধা' ছিল না। পণ্ডিতজী কিন্তু একই সঙ্গে শীতল ও উত্তপ্ত বাণীর ঝর্ণা বইয়ে দিতে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে অস্বীকার করেননি, নিন্দাবাদও করেননি। অথচ স্বয়ং গান্ধীজী সেই আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। এই সমস্ত কারণেই সেদিনকার ভারতে পণ্ডিত নেহরু সবচেয়ে বড় বীর বলে সম্মানিত ছিলেন। তা ছাড়া আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী সেনাপতিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পণ্ডিতজীর ব্যারিস্টারের পোশাক পরে কোর্টে উপস্থিতি প্রভৃতি কার্যকলাপের দ্বারা অতীতে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যে বিরোধিতা ছিল, সেই তিক্ত ইতিহাসটুকু পণ্ডিত নেহরুর অনুকূলে ও মহিমায় মুছে যায়। নিশ্চয়ই, ইতিহাসের সেই চরম বৈপ্লবিক মুহূর্তে পণ্ডিত নেহরুর কি ভূমিকা ছিল, সেই ঘটনার পুনর্বিচার ঐতিহাসিকরা একদিন করবেনই করবেন।

ঐদিন চৌপট্টির সমুদ্র-সৈকতে তিনি যে ভাষণ দেন আমরা তার কিছু কিছু অংশ পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে এখানে তুলে দিচ্ছি।

উক্ত সভায় বল্লভভাই প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই ভাষণ ছিল তাঁর নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল সুরে। সর্দার প্যাটেল সে সময়ে খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না। তাই বোম্বাইয়ের সেই উত্তেজিত মুহূর্তে নিজে থেকে তিনি কোন সভা ডাকেননি। বোম্বাইয়ের বীর বিপ্লবী জনতাকে শান্ত করবার মতো তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না। পণ্ডিত নেহরুরও বোধহয় সেই ক্ষমতা ছিল না। কেনমা, তিনি যখন বোম্বাইতে আসেন নৌ-বিদ্রোহের তখন অবসান হয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছেন। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ অথচ স্তব্ধ, কেন না, সৈনিকরা এবং মহান জনসাধারণ এই ধরনের আত্মসমর্পণ আশা করেনি। তাই পণ্ডিতজীর সেদিনকার ভাষণ, একজন ব্যারিস্টার রাজনৈতিক নেতার অগ্নিবর্ষী ভাষণের বেশি কিছু নয়—উভয় দিকেই যা কাটে।

তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, "ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর বিদ্রোহ করার অধিকার আছে ; কমাণ্ডার-ইন্-চীফ তাঁর বেতার-ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে, সশস্ত্রবাহিনীতে তিনি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না এবং ডিসিপ্লিন্‌ই সেখানকার প্রথম ও শেষ কথা। আমি তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত ; কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনী হতে হবে।

"আমাদের সৈনিকরা রাজনীতি ও তাঁদের কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা বিরোধ টেনে বিদেশী সরকারের আজ্ঞাবাহী ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ করে যেতে পারেন না। আমার মতে, আমাদের আর্মি ও নেভীকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি-সচেতন হওয়া উচিৎ। কেননা, তাঁরা কেবল সৈনিকই নন, তাঁরা সচেতন নাগরিকও বটে, এবং সচেতন নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের সৈনিকেরা তাঁদের দেশের প্রতি

কর্তব্য এবং সৈনিকোচিত নিয়মানুবর্তিতা এই দুই প্রেরণার বিপরীতগামী সঙ্কটের শিকার হয়ে পড়েছেন।

"শ্রীভুলাভাই দেশাই প্রথম আই. এন. এ. বন্দীদের বিচারের সময় অনবদ্য ভাষায় পরাধীন সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী তাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সকল নৈতিক অধিকার রাখে।

"সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আই. এন. এ.-র ঘটনাবলী, সাম্প্রতিক আর. আই. এ. এফ. এবং আর. আই. এন.-এর ধর্মঘট দেশের স্বার্থে বা মুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। জনসাধারণের ও সশস্ত্র-বাহিনীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা এই সব অভিযান দূর করে দিয়েছে। আজ জনতা ও সৈন্যরা পরস্পরের নিকটে এসে গেছে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ভারতীয় যুবক আর্মি, নেভী ও এয়ারফোর্সে যোগ দেয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন। যুদ্ধের সময়ে সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহু ধরনের অপমান, জাতিগত বৈষম্য ও অত্যাচার ভোগ করেছেন; যুদ্ধের অবসানে এঁদের মধ্যে কেউ এই অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন যা নানা ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে।

"এঁদের প্রতি আমার প্রভূত সহানুভূতি আছে, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্রধারণ করা ঠিক হয়নি। এই ছেলেরা জানত যে, তারা কতবড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। তাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না, সামান্যই গুলী-বারুদ ছিল, অথচ প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য শক্তি কতই না বিপুল! বিদ্রোহের প্রেরণায় প্রতিপক্ষ সামরিক প্ররোচনা দিয়ে এই যুবকদের শত্রুর ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করেছিল।

"সম্প্রতি আর. আই. এন.-এর ধর্মঘটে এই বীর নাবিক যুবকেরা একটা ভুল করেছে বটে, কিন্তু তাদের ক্ষমা করা আমাদের কর্তব্য। এবং এদের প্রতি যাতে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাও দেখা আমাদের কর্তব্য। কোন কোন সংবাদপত্রে দেখলাম সর্দার প্যাটেল নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। মৌলানা আজাদও নাকি ঐরূপ গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদের পক্ষে ঐরূপ গ্যারান্টি দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। একমাত্র গভর্ণমেণ্টই সেই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে এবং তা রক্ষা করতে পারে।

"কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র আর. আই. এন.-এর ছেলেদের ব্যাপারে নয়, কেবল বোম্বাইয়ের ব্যাপারে নয়, সমস্ত ভারতে এ-জাতীয় বিদ্রোহ, বিক্ষোভ প্রভৃতি ঘটনার প্রকাশ্য তদন্ত করা দরকার। অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্মসমর্পণের সবরকম সুবন্দোবস্ত করতে হবে—যেমন, আই. এন. এর অভিযুক্ত সৈন্য ও অফিসারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

"সশস্ত্রবাহিনীর লোকেরা আজ এ ধরনের ব্যবহার করছে কেন? কালের পরিবর্তন ঘটেছে। শাসকবর্গের জানা উচিত যে, অতীতে যেভাবে এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে শাসন চলত, আজকের দিনে তা হবার উপায় নেই। সশস্ত্র-বাহিনীর লোকেরা আজ তাদের দেশের ও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য বুঝতে পারছেন।

"বিপ্লব ও গুণ্ডামী (rowdyism) এক জিনিস নয়। বস্তুত যে ধরনের বিপ্লবী কার্যকলাপ সামাজিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় না, তাকে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। এ হলো একধরনের বিপজ্জনক অ্যাড্‌ভেঞ্চার, যাতে জনসাধারণের নৈতিক বুদ্ধি ও সংগঠনকেই দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই

একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি বা স্ট্রাটেজী থাকে এবং সুপরিকল্পিত প্রচার থাকে। এসব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই যে ধরনের বিপ্লবের মধ্যেই আমরা প্রবেশ করি না কেন, আমাদের দেখতে হবে ডিসিপ্লিন্ রক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সমস্ত কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে।"

চৌপট্টিতে পূর্বদিনের ভাষণে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তব্যে জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি মনে করেই হয়তো পরের দিন পণ্ডিত নেহরু আবার একটি প্রেস কনফারেন্স করে দু'ঘণ্টা ধরে সেখানে তাঁর বক্তব্য রাখেন। অধিকন্তু, ধর্মঘটী নাবিকদের কোন শাস্তি দেওয়া হবে না (no victimisation), এই ধরনের প্রতিশ্রুতি ভারতের ব্রিটিশ সরকার রাখবার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছিলেন না। ফলে, পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে বোম্বাইয়ের জনগণকে সন্তুষ্ট রাখা অত সহজ হচ্ছিল না। তাই, এই প্রেস কনফারেন্সে আবার তাঁকে তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক প্রকৃতির উত্তপ্ত বাণীর বাক্য-বিন্যাস করতে দেখা যায়। তিনি বললেন,—"আমি জানতে পেরেছি কমাণ্ডার-ইন্-চীফের বেতার-বার্তার ঘোষণা সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুকুম চালু হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সত্যি এমন ধরনের দেওয়া হচ্ছে, যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে (Terrorisation, not merely victimisation)। কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীতে সহকারী যুদ্ধ সেক্রেটারী মিঃ ম্যাসন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিরও কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না।"

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে ১৯৪২ সালের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট সম্বন্ধে, অর্থাৎ শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী প্রভৃতির কার্যকলাপ

সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি—এ প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন ঃ

"যেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করা সম্ভব, সেখানে অন্য কোনভাবে বা গোপনভাবে কাজ করার চেষ্টা ফলপ্রসূ তো নয়ই, বরং অর্থহীন বলা যায়। গত দু'তিন বছর যাবৎ যখন অবস্থা সেরকম ছিল না, তখন ভিন্ন ধরনের কাজের কথা ভাবা যেতে পারে। এ বিষয়ে কেউ একমত হতে পারেন, না-ও হতে পারেন। কিন্তু যেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র ও সুযোগ রয়েছে, সেখানে গোপনভাবে চলার কোন অর্থ হয় না। সেক্ষেত্রে জনসাধারণকেই গোপন করে চলার রেওয়াজ গড়ে ওঠে এবং সত্যিকার কোন গণ-আন্দোলন গোপনীয়তার পথে গড়ে উঠতে পারে না।"

শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর গত কয়েক বছরের কার্যকলাপ তিনি পছন্দ করেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—"আমি তাঁর কার্যকলাপ সমর্থন করি না।"

হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন,—"আমি আমার নিজের কথাই বলতে পারি। হয় তো আরও অনেকে এ বিষয়ে একমত হবেন। আমি মনে করি, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আজ এবং অতীতেও অহিংসা ও তার রীতিনীতি উপযুক্ত,—বর্তমানের ভারতের ও পৃথিবীর পরিস্থিতির বিবেচনায়। যদি আমরা হিংসা-নীতির কথাই ভাবি তবে আমাদের অধিকতর যোগ্য সহিংস উপায়ের কথা ভাবতে হবে। শত্রুপক্ষের সশস্ত্র শক্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর হিংসার বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতর হিংসার কথা ভাবা বোকামি মাত্র। কোন সশস্ত্রবাহিনীর সেনাপতি সেভাবে ভাবতে পারেন না।"

তিনি কেন তবে আই. এন. এ. সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন, এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বললেন, "আই. এন. এ.-র

শিক্ষা থেকেই আমি বরং একথা বলি যে, এদেশে অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যে-ভাবেই হোক লড়েছেন, সে এক কথা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের কথা সম্পূর্ণ আলাদা কথা বা প্রশ্ন। আই. এন. এ. সশস্ত্র পথ নিয়েছিলেন এবং তাঁরা ব্যর্থ হন। আই. এন. এ. যদি সার্থক হতো, তবে প্রশ্নকর্তা হয়তো বলতে পারতেন যে, সহিংস সংগ্রাম সার্থক হয়েছে। আই. এন. এ. ব্যর্থ হয়েছে সশস্ত্র অথবা অহিংস সংগ্রামের জন্য নয়। ব্যর্থ হয়েছে বাহ্যিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতার জন্য। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থায় বৃহত্তর শক্তিগুলি তাদের প্রতিকূলে ছিল বলেই তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

"আই. এন. এ.-র সঙ্গেবর্তমান ভারতের পরিস্থিতির তুলনা করা চলে না। কেননা, আই. এন. এ.-কে কাজ করতে হয়েছে দেশের বাইরে থেকে এবং সেক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কোন ক্ষেত্র ছিল না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যখনই আমাদের দেশে হিংসা ও অহিংসার কথা ওঠে, তখনই আমরা স্থান-কাল-নির্বিশেষে শিশুসুলভ কথাবার্তা বলে থাকি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-বিতর্ক করি। লোকে ভুলে যায় যে, আমরা বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। যখনই আপনারা কোন দেশের মুক্তি বৈপ্লবিক সহিংস পথে আনবার কথা ভাববেন, তখন সে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী-শক্তিকে বিনষ্ট করে দেবার জন্যে রাষ্ট্রের হাতে কি রকম নিষ্ঠুর সহিংস শক্তি আছে, সে-কথা আপনারা ভাবেন না। গত পঞ্চাশ বছরে রাষ্ট্রের violence-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে শক্তি আজ রাষ্ট্রের এত বেশি যে, জনগণের সাধারণ সহিংস শক্তি তার তুলনায় অতি নগণ্য। যাঁরা ব্যারিকেডের কথা বলেন, তাঁরা আজ ফরাসী-বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা

বলেন। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি ও বিদ্রোহী জনসাধারণের শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা সত্যি খুব বেশি ছিল না। এমন কি আজকের দিনেও সশস্ত্রবাহিনীর সৈনিক ও নাগরিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা, বিমান, ট্যাঙ্ক ও বোমা প্রভৃতি অতি আধুনিক মারণাস্ত্র সাধারণতঃ সাধারণ সৈনিকের হাতের বাইরে।"

তিনি আবার বললেন, "আজকের দিনে হিংসা ও অহিংসার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে তর্কের অবসর তত নেই, যত আছে তাদের বাস্তব ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে। হিংসার পথ সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনাই বৃথা হতে বাধ্য—যদি না সৈন্যবাহিনীর হিংসাত্মক ক্ষমতার কথা আলোচ্য বিষয় না হয়। সামান্য ধরনের বা petty রকমের সশস্ত্র সংঘাত হয়তো সাময়িকভাবে একটা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যাবে অধিকতর যোগ্য violence-এর ক্ষমতা কোথায় এবং কার! তাছাড়া এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিংস প্রচেষ্টা বা সংঘর্ষ একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটা ভারসাম্য স্থির করতে অসমর্থ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত একটি বিকল্প স্থায়ী সর্বজন-স্বাকৃতি শক্তির বা authority-র জন্ম দিয়েছে, যে শক্তি বা authority-র সাহায্যে ঈপ্সিত সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা চলে। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলতেই থাকে, একটা স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

"আজকের দিনে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষের প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই সম্ভবপর। আমরা কোন দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নই, আমরা শক্তিধর

আন্দোলনের সন্তান, আমাদের পক্ষে ছোট-খাটো violence-এর চক্র সৃষ্টি করে চলা উচিত নয়। ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি, ছোট-খাটো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হয়ে অনেকেই ভাবেন যে, তাঁরা বিপ্লব তরান্বিত করছেন। আমি বলি তাঁরা তা করছেন না, বরং বাধাই সৃষ্টি করছেন। যদি সত্যি সত্যিই সহিংস পথ ধরতে হয়, তবে তাকে বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে সংগঠিত করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি চালাতে হবে। ক্ষুদ্রাকারের violence কেবলমাত্র অসিংহার পক্ষেই বাধা নয়, সত্যিকারের ব্যাপক violence-এরও অন্তরায়। এতে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় মাত্র, প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে জাগানো হয়।"

বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু বললেন,—"বোম্বাইয়ের রেটিংদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি যে প্রচুর, সে-কথা সহজবোধ্য। কামান ব্যবহারের ফলেই জনসাধারণের উত্তেজনা এত উচ্চ পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল। যদিও এই সমস্ত কামানের গুলী কোন ক্ষতিকর হয়নি, তবু জনসাধারণ মনে করেছিল বুঝি বা দুই পক্ষের মধ্যে একটা ভয়ানক লড়াই হয়ে গেছে শুধু। কার্যতঃ লড়াইটা কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে অতটা কিছু ঘটেনি।

"শহরে নানা ধরনের নানা ল ও উপদল আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বিপ্লবী মনে করে, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর রণকৌশলের উপরে যেতে রাজী নন। কম্যুনিস্টরা নিজেদের ভয়ানক বিপ্লবী বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রতি-বিপ্লবী মনে করি। তাঁরা বিপ্লবী তো ন:ই বরং কার্যতঃ ভয়ানক রক্ষণশীল।"

পরমুহূর্তেই পণ্ডিতজী বললেন, বিশেষ করে শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও অরাজকতার প্রতি লক্ষ্য করে ঃ

"একদিকে সরকারের তরফ থেকে নির্বিচারে গুলী-গোলা

প্রয়োগ, শত শত ব্যক্তির মৃত্যু, অপর দিকে শহরের নানা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি মর্মাহত। জনসাধারণের কিছু কিছু অংশ যেভাবে অনাচারী ব্যবহার করেছে, বিশেষত বিদেশীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁদের টাই, টুপির ধ্বংস-সাধন করে তাঁদের অপমান করেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করি।"

বলিহারী অদৃষ্টের পরিহাস! পণ্ডিতজীর ভাষায়ই সেখানে শত শত ভারতীয় (প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মারা গিয়েছিল হাজার হাজার, যার সঠিক সংখ্যা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি) ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সরকারের নির্বিচারে গুলী-গোলার প্রয়োগে, তার জন্য সামান্য ভদ্রতার খাতিরেও দুঃখ প্রকাশ করলেন না। অথচ বিদেশীদের টাই, টুপি খুলে নিয়ে আগুনে পুড়ে ফেলায় মহান বীর জনগণকে এই কাজের জন্য তীব্র ভাষায় নিন্দা করতে ভুললেন না।

এবারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিবৃতির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। চৌপট্টির যে সভায় পণ্ডিত নেহরু ভাষণ দেন, সেই সভারই সভাপতি ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সর্দার প্যাটেল জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের অপব্যবহার করে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জনসাধারণকে বিপথে চালিত করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে ভারতবাসীদের সচেতন করে দেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেস যেখানে কোনপ্রকার বিদ্রোহের ডাক দেয়নি, উপরন্তু জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছে, সেখানে জনসাধারণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

"কংগ্রেসেরই নাম করে যে সমস্ত কংগ্রেসের লোক জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিচ্ছেন আমি তাঁদের সম্বন্ধেও দেশবাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। জনসাধারণ একমাত্র কংগ্রেস

হাই-কমাণ্ডের কথাই শুনবেন, আমি এটাই আশা করি। যদি আপনারা মনে করেন যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুল করছেন, তাহলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করুন। কিন্তু যদি কংগ্রেস নেতৃত্বই মানেন, তবে কংগ্রেসের আদেশ আপনাদের শুনতেই হবে।"

তিনি আরো বলেন, "কম্যুনিস্ট পার্টি জনসাধারণকে ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছে ও তাদের স্বদেশপ্রেমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। গত কয়েক বছরে তাদের মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই কম্যুনিস্ট পার্টি এ ধরনের উস্কানি দিয়ে চলেছে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে কম্যুনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে, সেই গ্লানি ও অপরাধকে মুছে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের এই বিপ্লবীয়ানা।

"এই পার্টি এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলছে, কিন্তু কে আজ তাদের বিশ্বাস করবে বা করতে পারে? তাদের এই উস্কানি বেশিক্ষণ কার্যকর হতে পারে না, অচিরেই তাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে বাধ্য।

"ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতার অভাব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আমি বিশেষভাবে দুঃখিত। যদি তারা, আমার মতে, কিছু ভাল কাজ করতে চান তবে তাঁরা যেন কংগ্রেসের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানেন।"

এ ছাড়াও নৌ-বিদ্রোহের ফলে দেশে যে একটা ভয়ানক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে-কথা সর্দার প্যাটেল সভায় বলেন, এবং এই নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে শুক্রবার দিন শহরে যে সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণা করা হয়েছে তার বিপজ্জনক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। এই ধর্মঘট যাঁরা ঘোষণা করেছেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলে সর্দার প্যাটেল অভিযোগ করেন, যেহেতু তাঁরা সর্বাঙ্গীণ অবস্থার গুরুত্ব অনুভবই করতে পারছেন না।

এ সমস্ত তথাকথিত জনদরদী নেতারা নিজেদের যেমন আত্মপ্রতারিত করছেন, তেমনি জনসাধারণকে বিপথগামী করে জনসাধারণের এবং শহরের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছেন বলে মন্তব্য করেন।

নৌ-বিদ্রোহের ঘটনার অনতিকাল পরেই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। পণ্ডিত নেহরুই প্রধানমন্ত্রী হন, সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। জিন্না সাহেবের দলও ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ধর্মঘটী নাবিকদের সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার পালন করেনি, কংগ্রেস এবং লীগ সরকারও তা পালন করলেন না। ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং লীগের ভূমিকা ছিল একই।

ভারতের ভাগ্যাকাশ মসীলিপ্ত হলো। সাগর পারে লোকের মুখে শুনতে পেলাম,—বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে আবার সেই পলাশীর দ্বিতীয় যুদ্ধ সৃষ্টি করলো!

মনে আজ প্রশ্ন জাগে, গান্ধীজী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেহরুজী বা কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড কোনদিন তো বলেননি যে, দেশের চরম সঙ্কটের দিনে তাঁরাই সশস্ত্র বিপ্লব করে দেশকে মুক্ত করার নেতৃত্ব দেবেন! এঁরা আর যা-ই ধোঁকা দিয়ে থাকুন না কেন, দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা মুক্ত করবেন—এমন ধোঁকা কোনদিনই দেননি। তবু বিপ্লববাদী নেতারা তাঁদের কাছে বারে বারে অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের হাই-কমাণ্ডের কাছে বিপ্লবী নেতৃত্ব চাইতে যাচ্ছেন কেন?

এর উত্তরে, আমার মনে যা হচ্ছে, বিপ্লবী নেতাদের চরিত্রগত এবং মনুষ্যত্ব-জনিত সত্যনিষ্ঠাসম্ভূত আদর্শের অভাব আছে। এই আদর্শের অভাব থাকায় প্রকৃত দেশপ্রেমেরও অভাব দেখা দিয়েছে। কেন না, দেশপ্রেম তো আদর্শেরই উপরে নির্ভর করে থাকে,

একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। যাঁরা বিপ্লববাদে বিশ্বাসী তাঁদেরই তো দায়িত্ব ছিল এই বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব দেওয়া। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা তো সেই কাজের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে দায়িত্ব পালন করার অপূর্ব সুযোগ, যাকে সুবর্ণ সুযোগ বা শেষ সুযোগ বলা যায়—দেখা দিয়েছিল সেই মহান নৌ-বিদ্রোহে। বিদ্রোহী নাবিকদের বল্লভভাই প্যাটেল, মুসলীম লীগের কাছে যেতে বলেছিল কে? ঐ লাল পতাকাধারী তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টিই নয় কি? অনেক কম্যুনিস্ট নেতা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই বিদ্রোহী নাবিকদের সাথে সহযোগিতা করেছিল, তাদের দাবির সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, কিছু খাবার ও পানীয় জল সরবরাহ করেছিল। আর ভারতের অন্যান্য শহরেও নাবিকদের দাবি-দাওয়ার উপরে সভা-সমিতিও করেছিল।

নিশ্চয়ই করেছিলেন। আরও কিছু কিছু ছোট-বড় দলও তা করেছিলেন। অথচ বোম্বাইয়ের জনগণ কারও কোন নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেও ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘট আর হরতাল করার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাদের বহুদিনের। খাবার দিয়েছিল, ঐ উপলক্ষে গোরা সৈন্যদের ধরে ঠেঙিয়েছিল এবং অনেকে প্রাণও দিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্টির কোন সঠিক প্ল্যান-প্রোগ্রাম-মাফিক নেতৃত্ব ছিল কি,—একমাত্র শ্রীমতী কমলা ডোণ্ডের কথা ছাড়া?

কিন্তু একমাত্র শ্রীমতী কমলা ডোণ্ডেকে দিয়েই গোটা কম্যুনিস্ট পার্টিকে আমরা বিচার করব না। বিচার করব কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে এই সর্বাত্মক বিদ্রোহকে সে সঠিকভাবে পরিচালনা করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে গিয়েছিল কিনা,—না কি সে মাঝপথে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল? কার্যতঃ দেখা গেছে শেষের যা জিজ্ঞাস্য তাই ঘটেছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারির পার্লামেণ্টের ঘোষণার প্রতি ভারতের তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টিও ঝুঁকে পড়ছিল—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এইভাবে ভাবের ঘরে চুরি, প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার দ্বারা বিপ্লব হয় না। যে-সুযোগ ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি হারিয়েছে তা আর আসবে বলে আমি মনে করি না। ঐ সময়ে সঠিক নেতৃত্ব যদি সে দিত তা হলে, আমার দৃঢ় ধারণা, বর্তমান ভারতের রাষ্ট্র-কাঠামো অন্য ধরনের হতো।

কম্যুনিস্ট পার্টি এখনও জনযুদ্ধের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যদিও তাদের মুখপত্র এখন "পিপলস্ ওয়ার" থেকে "পিপলস্ এজ"-এ এসে গেছে। কিন্তু "পিপলস্ এজ"-এ এসে "পিপলস্ রিভোল্টের" প্রোগ্রাম ১৯৪৮ সালের পূর্বে তাদের দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৪৯ সালে আবার সবার মাথায় উনপঞ্চাশ রকম বায়ু ক্ষেপে গেল। কথায়ও বলে, 'ফর্টিনাইন-এর ভূত চেপেছিল'। এ ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত। একে হোয়াইট্ ওয়াশ করা কি সম্ভব? বাস্তব ইতিহাসকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। ইতিহাসের অলিখিত দপ্তরে সব কথা বেঁচে থাকে, অদ্ভুত তার বেঁচে থাকার ক্ষমতা।

কংগ্রেস যেমন তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি—আজ অনেক অপরাধ ধরা পড়ছে, লীগ যেমন পারেনি—তার অনেক অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উঠেছে পাকিস্তানেও, বাংলাদেশ তো সৃষ্টিই হলো। কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা যেমন পারেনি, কম্যুনিস্টরাও পারবে না,—সব কথা উঠবে। তারই একটা নমুনা এই দক্ষিণ ও বামপন্থী কম্যুনিস্ট সঙ্কটের মধ্যে নেই কি? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া আর চীন-এর সঙ্কট কি কম? সুতরাং অযথা আমরা যেন কেউ বেশি বীর না সাজি। সত্যনিষ্ঠা এবং বিনয়সহকারে একটু আত্ম-সমালোচনা দরকার।

অতএব অতবড় সুযোগ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেও দেখা

যায়নি। জাহাজ দখল করে থাকলেই তো হবে না, বোম্বাই দখল করাই তখন একমাত্র কাজ ছিল। নাবিকেরা সেই ব্যবস্থাই করেছিল।. বাধা দিলেন কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা। এমন যে হতে পারে এই ভেবে ভয়ে বোম্বাইয়ের লাটসাহেব পর্যন্ত সেদিন পুণাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। জেনারেল লকহার্টের ওপর শহরের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। মারাঠী সৈন্যরা যখন গুলী-গোলা চালানোর হুকুম শুনলো না, আর সর্বভারতে যখন ভারতীয় সৈন্যরা—এমনকি গুর্খা রেজিমেণ্ট পর্যন্ত হুকুম মানতে রাজী নয়, নৌ-বিদ্রোহের দু'একদিন আগে থেকেই যখন ভারতীয় বিমান-বহরের সব লোকেরা ধর্মঘট করে আছে, সর্বত্র যেখানে মজুরেরা ধর্মঘট করে চলেছে, আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর লোকদের মুক্তির জন্য যখন কলকাতা ফেটে পড়ছে—বোম্বাই, করাচী, কলকাতার মতো প্রধান তিনটি শহর যেখানে প্রায় বিদ্রোহী—সে অবস্থায় বোম্বাই শহর দখল করে সর্বভারতে বিপ্লব সুরু করে দেওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল।

এতবড় সংগ্রামের পরিধি ১৯২১, ১৯৩০-৩২ এবং ১৯৪২ সালের সংগ্রামগুলিকেও অনায়াসে ম্লান করে দিত। এমন কি আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর সংগ্রামের ভবিষ্যৎও তার তুলনায় ম্লান হয়ে যেত। কম্যুনিস্ট পার্টি যদি বিজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে সে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারলো না কেন? বিজ্ঞান তো নির্ভুল বস্তু। পরিশেষে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে যুগে যুগে যে প্রশ্নটি মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে তা হলো স্বাধীনতার নাম করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে খণ্ডিত না করে স্বাধীন করার আর কোন উপায় ছিল কি না! ঐতিহাসিকরা যা ঘটে তার বর্ণনা দিয়েই খালাস, যা ঘটতে পারতো, অন্যরকম কিছু ঘটতে পারতো কিনা সে জাতীয় গবেষণার মধ্যে সাধারণত যান না। সে কাজ প্রধানত রাজনীতিবিদ্‌দের। স্বাধীনতা পেয়েই যে-সব ভারতীয় ও পাকিস্তানী নেতারা আত্ম-সন্তোষে বিভোর হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে ভারত-

বিভাগকে একটা অনিবার্য বিকল্পহীন ঘটনা বলে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা ছিল এবং আজও থাকবে। Apologist হওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোন উপায় নেই।

কিন্তু যাঁরা বিপ্লববাদী বলে নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ সুযোগটা বোধহয় নৌ-বিদ্রোহকে অস্বীকার করেই হারিয়ে যায়। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবের শেষ পদধ্বনি ঐ নৌ-বিদ্রোহের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল, সে বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য, বাণী ও আদেশ সেদিনকার কি বাম কি দক্ষিণ কোন দলই অনুভব করতে পারেননি —এমন কি অরুণা আসফ আলী প্রভৃতিও না। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর অথচ সত্যনিষ্ঠ বিচারের রায় থেকে কারও নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সে বিদ্রোহ ও বিপ্লব ব্যর্থ ও পরাস্ত করার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বেরই নয়—কংগ্রেস-বিরোধী তথাকথিত বিপ্লবীদের দায়িত্ব এবং অংশও তাতে কম নয়।

পরিষ্কার বোঝা যায়, মূলতঃ সেদিনকার ভারতবর্ষের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষগুলিকে পণ্ডিত নেহরু শান্ত বা দমিত করার জন্যই বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক অজুহাতগুলি দিচ্ছিলেন। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবে নৌ-বিদ্রোহ ও অন্যান্য সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পারে, একথা যদি সত্য হয়, তবে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে নিজেকেই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অথবা দেওয়ার কি অন্তরায় ছিল? অন্যান্য তথাকথিত বিপ্লবীদের অপরিপক্কতা ও চিন্তার স্থবিরতা নিয়ে ঠাট্টা করা চলে তাঁরই, যিনি বিকল্প সত্যিকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। কাজে কাজেই সহিংস ও অহিংস উভয় দিক থেকেই তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার জন্য কি মহাত্মা গান্ধী, কি পণ্ডিত নেহরু, কেউ কিছুই করেননি। জনসাধারণের প্রতি যত সহানুভূতি ও

দরদই দেখানো হোক না কেন, উত্তেজিত ধর্মঘটী নাবিকদের অথবা সহানুভূতিশীল বিদ্রোহী বোম্বাইয়ের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সেদিন পণ্ডিত নেহরু অথবা মহাত্মা গান্ধী পথে এসে জনতার সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াননি বা তাঁদের (জনসাধারণকে) পরিচালিত করেননি।

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের তিনমাস বাদে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনে শ্রীটেকচাঁদ ছাড়াও, কোঁয়ার দুলিম সিং, মিঃ জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ্, কে. বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, বিচারপতি বিশ্বাস এবং স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার সদস্য হিসাবে ছিলেন। কিন্তু ছ'শো পৃষ্ঠার সেই রিপোর্ট কখনও পাবলিক ডকুমেণ্ট হিসাবে উপস্থিত করেননি। স্বাধীন সরকারও সে রিপোর্ট নিষিদ্ধ করেছেন। কেন করেছেন, এ প্রশ্ন আজ ওঠা উচিত। রাজনৈতিক দল এবং নেতাদেরই সর্বাগ্রে উচিত তা প্রকাশ করার চেষ্টা করা। কিন্তু মনে হয়, তাঁরা যেন একে চেপে রাখতেই চাইছেন। কিন্তু কেন?—এ প্রশ্ন করতে পারি কি? নৌ-বিদ্রোহের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রহণে প্রচুর দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠার অভাব আমাদের ভেতরে রয়েছে সদা বিরাজমান।

ভারতে নৌ-বিদ্রোহের তাৎপর্য হলো, যুদ্ধ শেষে নাবিক, সৈনিক, শ্রমিক, বৈমানিক সবারই মধ্যে বিদ্রোহ-প্রবণতা জেগে উঠেছিল। হারিয়ে-যাওয়া জাতীয় সংহতি ও শ্রেণী-সচেতনা মাথা তুলে উঠেছিল। আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর কার্যকলাপের ইতিহাস যখন প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন এদের চেতনায় আগুন ধরে গেল। ১৯৪২ সালের পরাজিত সংগ্রামেব প্রতিশোধ নিতে দেশের সর্বত্র জাগরণ দেখা দিল। যুদ্ধের দ্বারা—সে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হোক আর 'জনযুদ্ধই' হোক—তারা (দেশের জনসাধারণ) যে কত প্রতারিত হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। নেতাজী

সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিসন্ধিটা যে কত জঘন্য ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রজাত ছিল সে বিশ্বাসও তারা ফিরে পেল।

ওদিকে ১৯১৭ সালে সীমান্ত-ফেরত রুশ-নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হলো। অথচ তার চেয়ে অনেক বেশি কারণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী চেতনা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে পরিণত তো হলোই না, উল্টো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে দেশ ভাগ হয়ে গেল। রক্ত দিল, প্রাণ দিল, গৃহহারা হলো লক্ষ লক্ষ লোক—কিন্তু স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জন্য নয়, দেশ ভাগ করার জন্য। আমাদের দু'শো বছরের পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে বিপ্লবের যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই রুশ দেশের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ রুশীয়দের বিদ্রোহের যৌক্তিকতার চেয়ে দশগুণ বেশি। তবু এমনটা হলো কি করে? আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা কি কম ছিল? আমাদের দুঃখের ও বঞ্চনার সঞ্চয় কিছু কম ছিল কি? একেবারেই নয়। তবে?

ভারত ও রাশিয়া—দুই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। তা হলো অভিজ্ঞতার পার্থক্য, নেতৃত্বের পার্থক্য। ১৯১৭ সালে সেখানকার জনগণ যখন আবার জাগতে সুরু করলো, তখন ১৯০৫ সালের অনেক অভিজ্ঞতা তাদের তহবিলে জমা ছিল। তাই গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, বন্দরে বন্দরে, কল-কারখানায়, সৈন্য-ব্যারাকে, নৌ-বহরে সর্বত্র রাতারাতি গড়ে উঠলো সোভিয়েট বা বিপ্লবী পঞ্চায়েৎ, আর তাদের চোখের সামনে বিচার-বিতর্ক চলতে থাকলো। বলশেভিক, মেনভেশিক, স্যোশাল্ রেভলিউশনারী, ক্যাডেট্ প্রভৃতি পার্টিগুলোর জাঁদরেল নেতৃত্বের তর্ক-বিতর্ক পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে চললো।

এদিকে আমাদের দেশের জনগণের চিত্তেও একটা দীর্ঘকালের সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে; কিন্তু সে প্রধানত হরতাল, ধর্মঘট আর কিছু কিছু বোমার ও বারুদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের ইতিহাস। তা

ছাড়া যে বিপ্লবের অভিজ্ঞতাটা সব প্রচেষ্টাকে চাপা দিয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তা হলো অহিংসা সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, ধর্মঘট ও হরতাল পর্যন্তই,—বড় জোর ১৯৪২ সালে কিছু কিছু অগ্নি-সংযোগ ও রেললাইন উপড়ানো পর্যন্ত। আর আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামের খবর পৌঁছেছিল মাত্র। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল ইত্যাদির কোন বিচারই সেদিন তো দূরের কথা আজও হয়নি। আজও নেতাজী একটা ভাবাবেগের আধার মাত্র হয়ে বহুজনের মনে স্থান নিয়ে আছেন। সেটা যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের রণকৌশল জাতীয় কোন নেতৃত্ব সে-কথা ক'জন লোক বিচার করেন? আর ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের তো কোন কিছুই বোধগম্য ছিল না দেশের নেতাদের ও জনগণের মানসে।

নৌ-বিদ্রোহ তথা সমগ্র ভারতের বিপ্লব-তরঙ্গ পরাস্ত ও ব্যর্থ করার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বেরই নয়, তথাকথিত বিপ্লবী বা বিপ্লববাদী কংগ্রেস-বিরোধীদের অংশ ও দায়িত্ব কোন অংশেই কম নয়। মনে হয়, ভারতে 'নবজাতক'-এর জন্ম না হলে ভারত সঠিক পথের নেতৃত্ব পাবে না।

আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত বাঙালী নৌ-বিদ্রোহী। সুমহান ও পবিত্র স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ-মুহূর্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই বীর বিপ্লবী নৌ-বিদ্রোহীদের। প্রণাম জানাই মহান বোম্বাইকে, মহান করাচীকে, মহান মহারাষ্ট্রকে!

ছন্দ ও গীতে কবিও বলেছেন:

"অমৃতের পুত্র মোরা,
কাহারা শোনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি,
আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!"